বনফুলের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

বনফুলের

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৫
অগস্ট, ১৯৫৮
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়চৌধুরী
ছেপেছেন
সুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলকাতা-৬
২·০০

১

খুব ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার বয়স তখন পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়। আমাদের বাড়িটা ছিল গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে। আশেপাশে বন-জঙ্গল। সাপ, বুনোশুয়োর, খরগোস, নানারকম পাখি এরাই ছিল প্রতিবেশী আর ছিল ছোট বড় নানারকমের গাছ, নানা ধরনের ফুল ফল লতাপাতা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে সরু একটি পায়ে-চলা পথ ছিল, পথটি এঁকে-বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ঘন-জঙ্গলের মধ্যে। মা আমাকে কিছুতেই ও পথে নামতে দিতেন না। তাঁর ভয় হত, কত রকমের জন্তু-জানোয়ার আছে, কি জানি যদি কারও সামনাসামনি পড়ে যাই।

সশরীরে সে রাস্তা দিয়ে যেতে পারিনি বটে, কিন্তু মনে মনে সে রাস্তা দিয়ে রোজই চলে যেতুম। চলে যেতুম এমন এক দেশে যেখানে ফুলেরা গান করে, পাখিরা গল্প করে, যেখানে চোখের জলের ফোঁটা মুক্তা হয়ে গড়িয়ে পড়ে, হাসিতে মানিক ঝরে। যেখানে কেউ পর নয়, সবাই আপন সবাই সুন্দর, যেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই, সবই সম্ভব।

মনে মনে সেই সরু পথটি ধরে চলে যেতুম স্বপ্নলোকে, যেখানে সত্য আর স্বপ্নে কোন প্রভেদ নেই। বড় হয়ে সেই পথ দিয়ে সশরীরে হেঁটে গেছি। গিয়ে হতাশ হয়েছি। পথ শেষ হয়েছে একটা ফাঁকা মাঠে, উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো মাঠ একটা। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশ-পাতাল তফাত!

বনফুল

ছোট্ট মেয়ে উর্মিকে—

মৎস্য পুরাণ

খুকুর বিয়ের গল্প, সে এক অদ্ভুত গল্প। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদেরও বলছি, দেখ তোমরা বিশ্বাস করতে পার কি না। খুকুর ভাল নাম মানকুমারী। মানের মরাই একটি, নামের মর্যাদা ও রেখেছে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলে ওঠে, নাকের ডগা কাঁপতে থাকে, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এখন তার বয়স ষোল, এখনও অমনি।

তার এই আশ্চর্য বিয়ের গল্প বলতে হলে শুরু করতে হবে তার ছেলেবেলা থেকে। যখন তার বয়স তিন কি চার তখন তার মাসি তাকে একটি বড় পুতুল উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে। বেশ বড় পুতুল, যেন বড়-সড় খোকা একটি। নীল চোখ, মাথার চুল চমৎকার কোঁকড়ানো, ঠোঁটদুটি টুকটুকে লাল, আর কী মিষ্টি হাসি তাতে! খুকু পুতুলটিকে দিনের বেলা তো কাছছাড়া করতই না, রাত্রেও কাছে নিয়ে শুত। কিন্তু এক আপদ জুটল দিনকয়েক পরে, ফন্‌তি মাসির বায়নাদার মেয়ে মনু। ভাল নাম মনোরমা। কিন্তু ঐ নামেই মনোরমা, কাজের বেলায় ঠিক তার উল্টো। একবার গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই, কাঁদছে তো কাঁদছেই; বাড়িতে কাক চিল বসবার উপায় নেই, বাড়ির লোকেদের প্রাণান্ত হবার উপক্রম। আর কথায় কথায় বায়না,—এটা চাই, ওটা চাই। এই মেয়েকে নিয়ে ফন্‌তি মাসি এল শরীর সারতে। খুকু জানত না তখন যে মনুটি কী চিজ, তাহলে কি আর তাকে পুতুল দেখায়?

আগেই লুকিয়ে ফেলত। কিন্তু তা হল না। মনু আসতেই খুকু একমুখ হেসে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমার পুতুল ছাখ্! চল্ একে নিয়ে খেলি গিয়ে। একে আজ বর সাজাই আয়। পাশের বাড়ির মান্তুর খুকি-পুতুল আছে, তার সঙ্গে বিয়ে দেব। মান্তুর বাড়ি যাবি?' মনু কিন্তু লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল পুতুলটার দিকে। কিছু না বলে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েই রইল মিনিট খানেক। তারপর বলল, 'ও পুতুল তোমার নয়, আমার—'

'ইস্, তোমার বৈকি! মাসি আমায় জন্মদিনে কিনে দিয়েছে—'

যুক্তি মানবার মেয়ে মনু নয়। সে আরও খানিকক্ষণ পুতুলটার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লাফিয়ে এগিয়ে গেল খুকুর দিকে, ছোঁ মেরে পুতুলটা কেড়ে নিয়ে বললে, 'আমার পুতুল—তোমার নয়। আমার—'

এরকম জবরদস্তি সহ্য করা শক্ত। খুকু এক ধাক্কায় মনুকে ধরাশায়ী করে কেড়ে নিল পুতুলটা। তারপরই শুরু হল মনুর আকাশ-ফাটানো চিৎকার। হাঁ-হাঁ করে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল —কুটুমের মেয়ে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, কী হল তার। খুকু এক ছুটে আগেই চলে গিয়েছিল চিলেকোঠার ঘরটাতে। সেখানে শ্রীমন্ত মালীর খোলা কাঠের বাক্সটাতে লুকিয়ে ফেলেছে পুতুলটাকে। যখন জানা গেল সামান্য একটা পুতুলের জন্যে এই কাণ্ড তখন খুকুর মা বললেন, 'কেঁদো না মনু, লক্ষ্মীটি, তোমাকেও আমি আনিয়ে দিচ্ছি ঠিক অমনি পুতুল।' পুরীর সমস্ত দোকান খুঁজেও কিন্তু ঠিক অত বড় দ্বিতীয় পুতুল আর পাওয়া গেল না। মনু ছোট পুতুল নেবে না, ঠিক অত বড় পুতুলই চাই। কিছুতেই কান্না থামে না তার। খুকুর মা শেষে খুকুকে বললেন, 'দিয়ে দাও তোমার পুতুলটা মনুকে। তোমার ছোট বোন হয়, কলকাতা থেকে তোমাকে আনিয়ে দেব একটা পুতুল। এখন ওটা দিয়ে দাও ওকে, ছোট বোনকে কি কাঁদাতে আছে?' মায়ের কণ্ঠস্বরে আদেশের আমেজ পেয়ে খুকু আর আপত্তি

করতে সাহস করলে না। দিয়ে দিলে পুতুলটা। কিন্তু বুক ফেটে গেল তার। মালী শ্রীমন্তর কাছে গিয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ল সে একেবারে। বৃদ্ধ শ্রীমন্ত মালীই তার মনের কথা বোঝে, বিপদে আপদে আশ্রয় দেয়, আবার প্রশ্রয়ও দেয় নানাভাবে। কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে কিনা, তাই যত আবদার তার কাছেই। সে ওড়িয়া ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, এতে কাঁদবার কী আছে! ওর চেয়ে ঢের ভাল পুতুল তাকে সে এনে দেবে। যদি এনে দিতে না পারে নিজের নাক কেটে ফেলবে সে। শুধু তাই নয়, নিজের নামও বদলে ফেলবে। শ্রীমন্তর মুখে এমন সব কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে খুকুর আশা হল। আজ পর্যন্ত শ্রীমন্তর কথার খেলাপ হয় নি। এই সেদিনও সে তাকে একটি পাকা চালতা এনে দিয়েছে লুকিয়ে।

মাসখানেক পরেই মনুরা চলে গেল। বলা বাহুল্য পুতুলটা নিয়েই গেল সে। পুরীর বাজারে আর তেমন পুতুল একটিও এল না। মামাবাবু কলকাতা থেকে জানালেন সেলুলয়েডের বড় পুতুল আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না আর। শ্রীমন্ত চেষ্টার ত্রুটি করছিল না অবশ্য। এদিক-সেদিক থেকে প্রায়ই সে পুতুল জোগাড় করে আনত। কখনও ন্যাকড়ার পুতুল, কখনও মাটির পুতুল, কখনও রবারের পুতুল। গালার পুতুলও এনেছিল একদিন। কিন্তু খুকুর একটাও পছন্দ হয়নি। শ্রীমন্ত কিন্তু নিজের নাক কাটবার জন্যে বা নাম বদলে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত হল না। সে ক্রমাগত খুকুকে আশ্বাস দিতে লাগল যে ওর চেয়ে ভাল পুতুল সে খুকুকে এনে দেবেই দেবে। দিলেও একদিন। ভারি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল একটা।

একদিন সকালে শ্রীমন্ত খুকুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আস্তে আস্তে বললে, 'তোর পুতুল এনেছি খুকু, জীয়ন্ত পুতুল!'

'কোথায়?'

'বাগানের পেছনে যে চৌবাচ্চাটা আছে, তার ভিতরে।'

'চৌবাচ্চার ভিতরে পুতুল রাখতে গেলে! কী বুদ্ধি তোমার শ্রীমন্তদা!'

'দেখেই যা না আগে।'

খুকু গিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেল!

এক-চৌবাচ্চা জলের ভিতর সত্যিই একটা জীবন্ত পুতুল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল সে। পুতুলের উপরটা মানুষের মত, কিন্তু কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত মাছ। মাছের প্রতিটি আঁশ যেন রুপোর তৈরি আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রামধনুর সাতটি রঙ। মাছের ল্যাজের পাখনাগুলোও অপরূপ. ঠিক যেন মখমলের তৈরি।

শ্রীমন্ত বললে, 'আমার এক জেলে বন্ধু আছে, সে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কাল তারই জালে ধরা পড়েছে এটি। আমি তার কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। চিড়িয়াখানায় বিক্রি করলে আরও বেশি টাকা পেত সে। বন্ধু বলে আমাকে দশ টাকায় দিয়েছে।'

খুকু অবাক হয়ে গেল।

খবর চাপা রইল না। দলে দলে লোক দেখতে এল মৎস্য-নারীকে। খুকুর কিন্তু আশ্চর্য লাগল, নারী কি নর, তা এরা ঠিক করছে কী করে! কিছু তো বোঝা যায় না। মাথার চুলগুলো একটু লম্বা। কিন্তু ছেলেদেরও লম্বা চুল হয়না কি? ঐ তো মাখনবাবুর ছেলে বুলু, লম্বা লম্বা চুল তার, মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করা আছে। পুরুষ কি মেয়ে যাই হোক, সুন্দর দেখতে কিন্তু। ধপধপে ফর্সা গায়ের রঙ, টানা-টানা চোখ, মিশকালো চোখের তারা, পাতলা ঠোঁটদুটি টুকটুক করছে। খুকু এগিয়ে যায় তার সঙ্গে ভাব করতে, সেও এগিয়ে আসে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

'তোমার নাম কী', খুকু জিগ্যেস করে।

চুপ করে চেয়ে থাকে সে, উত্তর দিতে পারে না। খুকুর মাঝে-

মাঝে মনে হয়, তার চোখদুটো যেন হাসছে। লজেন্স, বিস্কুট, সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার নিয়ে খুকু রোজ তাকে সাধাসাধি করে, সে কিন্তু স্পর্শ করে না কিছু। শ্রীমন্ত বললে, 'ও সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ খায়, আমি রোজ সকালে এনে দি।' শ্রীমন্ত আর একটা কাজও করে। সমুদ্র থেকে জল এনে চৌবাচ্চাটার জল বদলে দেয় রোজ। সমুদ্রের প্রাণী কিনা, কুয়োর জল সহ্য হবে না হয়ত।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল।

মৎস্যনারীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল খুকুর। মানুষের খাবারও খেতে লাগল সে ক্রমশ; বিস্কুট, মাছভাজা, টোস্ট, ওমলেট—খুকু তাকে রোজ খাওয়াত। মনে হতে লাগল কথা বলবারও যেন চেষ্টা করছে, কু-কু বলত মাঝে মাঝে। খুকুর কী আনন্দ! প্রথম ভাগ এনে পড়াতেই শুরু করে দিলে তাকে। মনে হত সেও যেন পড়ার চেষ্টা করছে। খুকু স্কুলে যেত না, একজন মাস্টারমশাই তাকে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন। খুকুর জেদাজেদিতে মৎস্যনারীকেও পড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁরও মনে হল, চেষ্টা করলে ওকে হয়ত কিছু শেখানো যাবে। খুকুর বাবা-মাও কৌতুক অনুভব করলেন এতে, মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখুন না, ওকে কথা কওয়াতে পারেন যদি। তাহলে খুকুর বেশ সঙ্গী হয় একটি।' মাস্টারমশাই চেষ্টা করতে লাগলেন। আর খুকুর তো কথাই নেই, সে যেন মেতে উঠল। সমস্তক্ষণই সে ওকে নিয়ে থাকত। অনেক বকাবকি করে তবে তাকে খেতে বা শুতে নিয়ে যাওয়া যেত।

মৎস্যনারী ক্রমশ কথা কইতে শিখল, লেখাপড়াও শিখতে লাগল।

তার পর প্রায় দশ বৎসর কেটে গেছে। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এখন খুকুর বয়স ষোল। মৎস্যনারীও বড় হয়েছে বেশ। তার জন্যে আরও বড় চৌবাচ্চা করানো হয়েছে, আর সেই চৌবাচ্চা ঘিরে

হয়েছে কাচের প্রকাণ্ড ঘর। আর-একটা বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটেছে যা চমকে দিয়েছে সকলকে। মৎস্যনারী আর নারী নেই, সে রূপান্তরিত হয়েছে নরে। তার গোঁফ উঠেছে। চমৎকার বাংলা কথা বলতে পারে সে, বাংলা ইংরিজি দুই পড়তে পারে, অঙ্ক কষতে পারে, এমনকি অ্যালজেব্রা অঙ্কও। চৌবাচ্চার ধারে প্রকাণ্ড টেবিল, টেবিলের উপর বইয়ের শেলফ্। এখন রীতিমত ছাত্র সে। মাস্টার-মশাই বলেন, খুকুর চেয়ে ওরই নাকি পড়ায় মন বেশি।

একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু। খুকুর বিয়ে নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। খুকু বলছে, সমুদ্রগুপ্তকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাস্টারমশাই ওর নাম দিয়েছেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তকে সমুদ্রের ধার ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ সমুদ্রের জল না পেলে ও বাঁচবে না। অথচ সমুদ্রের ধারে যেসব শহর বা গ্রাম আছে তাতে খুকুর যোগ্য কোনও পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। খুকুর বাবা ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ পর্যন্ত খোঁজ করে দেখছেন।

শেষে তাঁরা ঠিক করলেন জোর করেই খুকুর অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। পাটনায় খুব ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পাত্র হাতছাড়া করা উচিত নয়। খুকু নাহয় মাঝে-মাঝে এসে সমুদ্রগুপ্তকে দেখে যাবে। একটা পোষা জানোয়ারের সঙ্গে সমস্ত জীবনটা নষ্ট করবার মানে হয় কোনও? সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু সামান্য একটা জানোয়ার বলে মনে করতে কষ্ট হচ্ছিল খুকুর বাবা মার। রাজপুত্রের মতো চেহারা, কী বুদ্ধি, কী কথাবার্তা!

খুকুর মা বলেন, 'আহা, ওর নিচের দিকটা যদি মাছের মত না হত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিতাম। খুকুই তো আমাদের একমাত্র সন্তান। জামাইও ঘরে থাকত তাহলে।'

খুকুর বাবা বললেন, 'যা হবার নয় তা ভাবছ কেন!'

বিয়ের কথাবার্তা চলতে লাগল। একদিন খুকু শুনল তাকে দেখবার জন্যে পাটনা থেকে পাত্রের বাবা আসছেন।

গভীর রাত্রি।

সমুদ্রগুপ্তের ঘরে বসে খুকু কাঁদছিল। সমুদ্রগুপ্ত খুকুকে কখনও কাঁদতে দেখেনি। খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

'ও কী করছ তুমি—'

খুকু চোখের জল মুছে ফেললে।

'কী করছিলে?'

'কাঁদছিলাম।'

'কাঁদছিলে? কেন! বইয়ে পড়েছি লোকে দুঃখ হলে কাঁদে। কী দুঃখ হয়েছে তোমার?'

'তোমাকে ছেড়ে এইবার চলে যেতে হবে।'

'সে কী! কোথায় যাবে!'

'শ্বশুরবাড়ি। আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। পরশু আমাকে ওরা দেখতে আসবে।'

সমুদ্রগুপ্ত নির্বাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।'

'পাটনায় তুমি থাকবে কেমন করে? তোমার চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল চাই। সেখানে তো সমুদ্র নেই। তোমার মাছের অংশটা যদি না থাকত তাহলে কোন ভাবনাই ছিল না।'

তারপর একটু থেমে খুকু বললে, 'মা কাল কী বলেছিল জান? বলছিল সমুদ্রগুপ্তর নিচের দিকটা যদি মাছের মত না হত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিয়ে দিতাম।'

'তাই নাকি!'

সমুদ্রগুপ্তর সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার যে অংশটুকু মাছের মত সেটা জলের ভিতর নিস্পন্দ হয়ে গেল হঠাৎ।

তার পরদিন খুব ভোরে খুকুর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। শুনতে পেলে সমুদ্রগুপ্ত খুব জোরে-জোরে তার নাম ধরে ডাকছে। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে সে ছুটে চলে গেল সমুদ্রগুপ্তর ঘরে।

'খুকু দেখ দেখ, আমার মাছের খোলসটা ফেটে গেছে! আমি একা হাত দিয়ে ওটা ছাড়াতে পারছি না, তুমি একটু সাহায্য কর! আমি বুঝতে পারছি ঐ খোলসটার ভিতর আমার পা আছে। একটু জোরে টান, মাছের খোলসটা খুলে যাবে এখুনি।'

খুকু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। সত্যিই ফেটে গেছে খোলসটা।

'দাঁড়াও, আগে বাবার হাফপ্যান্টটা নিয়ে আসি তাহলে!'

ছুটে চলে গেল খুকু এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এল একটা হাফপ্যান্ট হাতে করে।

আধঘণ্টা পরে খুকুর বাবা মাও অবাক্ হয়ে গেলেন হাফপ্যান্ট-পরা সমুদ্রগুপ্তকে দেখে। এ কী কাণ্ড!

পাটনায় তক্ষুনি 'তার' চলে গেল, পাত্রের বাবার আর আসবার দরকার নেই। খুকুর বাবা পুরোহিত মশাইকে খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন। খুকুর মা গেলেন লুচি ভাজতে।

খুকু জিগ্যেস করলে, 'আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে। কী করে তুমি বেরুলে?'

সমুদ্রগুপ্ত বললে, 'ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্ত কত অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, আর আমি এটুকু পারব না? চেষ্টায় কী না হয়! আমি তোমার কথা শুনে সমস্ত রাত ধরে চেষ্টা করেছি—ভোরের দিকে ফেটে গেল খোলসটা—'

সাতদিন পরে খুকুর বিয়ে হয়ে গেল সমুদ্রগুপ্তর সঙ্গে।

বরকর্তা হল শ্রীমন্ত।

রাজা

নিপুর মামা বিজয়বাবু এলাহাবাদে থাকেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় এসেছেন। গোয়াবাগানে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে, সেইখানেই এসে উঠেছেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিপুদের বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে মামার বাড়িতে। মেয়েরা সকলে আগেই চলে গেছেন। কথা আছে, বাবা আপিস থেকে সোজা সেইখানেই চলে যাবেন। নিপুর ঠাকুরদা যান নি। তিনি সন্ধ্যাবেলায় রোজ ঠাকুরঘরে পুজো করেন, আফিং খান। আফিং খাওয়ার ঘণ্টা-দুই পরে ভাত খেতে বসেন। কথা আছে, দশটা নাগাদ মোটর এসে তাঁকে নিয়ে যাবে। নিপু, মিনু আর জগুও যায় নি। সন্ধ্যাবেলা মাস্টারমশাই তাদের পড়াতে আসেন। পড়াশোনা সেরে তারা ঠাকুরদার সঙ্গে যাবে এই ঠিক হয়ে আছে।

মাস্টারমশাই কিন্তু এলেন না। অগত্যা তারা তখন লুডো নিয়ে বসল তিনজনে। একঘেয়ে লুডো খেলা মোটেই ভাল লাগছিল না কারও। কিন্তু কী করা যায়, সময় তো কাটাতে হবে। এমন সময় ঠাকুরদা বেরিয়ে এলেন পুজোর ঘর থেকে।

'মিনু, এক গ্লাস জল এনে দাও তো দিদি। আফিংটা খেয়ে ফেলি।'

মিনু জল এনে দিলে। ঠাকুরদা আফিঙের বড়িটি টুপ করে খেয়ে ফেললেন।

মিনু বললে, 'ঠাকুরদা, যতক্ষণ মোটর না আসে ততক্ষণ একটা গল্প বলুন না—'

নিপু মহা উৎসাহে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বেশ। লুডো খেলা একটুও ভাল লাগছে না।'

জগু জিতছিল, তার খেলা বন্ধ করতে ততটা ইচ্ছে ছিল না, তবু সেও রাজি হয়ে গেল। ঠাকুরদার মেজাজ যদি ঠিক থাকে, গল্প জমবে ভাল।

'গল্প ?'...ঠাকুরদা পাকা গোঁফজোড়া মুচরে মিনুর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, 'এখন পড়াশোনার সময়, গল্প কেন ?'

'মাস্টারমশাই আসেন নি যে !'

'ও, আচ্ছা বেশ, এস তাহলে।'

তিনজনে এসে বসল ঠাকুরদার কাছে।

ঠাকুরদা বললেন, 'আলোটা নিবিয়ে দাও।'

মিনু উঠে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

ঠাকুরদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু করলেন :—'এক ছিল রাজা—'

'কী রকম রাজা ?' মিনু প্রশ্ন করলে।

'রাজা যে-রকম হয়।'

'চেহারা কী রকম বলুন।'

'রাজার চেহারা যেমন, তেমনি। শালপ্রাংশু মহাভুজ—'

'তার মানে ?'

'শালগাছের মত লম্বা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাত, ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফের গোছা !'

মিনু নাক সিঁটকে বললে, 'ও তো দারোয়ানের চেহারা। ওরকম হোঁৎকা রাজা চাই না।'

'ও বাবা, কী রকম রাজা তাহলে চাই তোমার ?'

'বেশ ভদ্র-চেহারার হবে। গোঁফের গোছা-টোছা চলবে না।'

ঠাকুরদা জগুর দিকে ফিরে বললেন, 'জগুর কী মত ?'

জগু বললে, 'আমার মনে হয়, রাজা যখন পুরুষ মানুষ তখন গোঁফ থাকাটা কিছু অন্যায় নয়।'

'বিমলদা কি পুরুষ মানুষ নয়? ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., টেনিস-চ্যাম্পিয়ন।'...মিনি ফোঁস করে উঠল।

'আচ্ছা আচ্ছা, ঝগড়া কোরো না। নিপুর মতটা কী শোনা যাক।'

নিপু বললে. 'আমার মনে হয়, রাজার শুধু গোঁফ নয়, গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। ঐতিহাসিক রাজাদের ছবি মনে কর—শাজাহান, পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড, শিবাজী...'

—'আকবর, জাহাঙ্গীর, রাণা প্রতাপ, মানসিংহ, এঁদের কিন্তু দাড়ি ছিল না, কেবল গোঁফ ছিল। গোঁফ-দাড়ি নেই এরকম রাজা কল্পনাও করা যায় না।' মিনুর দিকে চেয়ে জগু টিপ্পনি করলে।

মিনু বললে, 'কেন, অষ্টম এডওয়ার্ড?'

জগু হঠবার পাত্র নয়।

সে বললে, 'অষ্টম এডওয়ার্ড? কদিন সে রাজত্ব করেছিল শুনি? আমার বিশ্বাস, গোঁফ-দাড়ি কিছু ছিল না বলেই রাজ্যটি রাখতে পারলে না সে।'

মিনু বললে, 'আমাদের স্বাধীন ভারতের রাজা, পণ্ডিতজী? তার দেখ গোঁফ-দাড়ি কিচ্ছু নেই।'

জগু বললে, 'বোকচন্দ্র, পণ্ডিতজী রাজা নয়, মন্ত্রী। রাজা বরং বলতে পার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে, তাঁর গোঁফ আছে।'

নিপু এতক্ষণ কিছু বলেনি। জগু থামতেই সে পুনরায় তার মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলে।

'আমার মতে, রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। পশুদের রাজা সিংহ, তার পর্যন্ত গোঁফ-দাড়ি আছে। মানুষের রাজার থাকবে না?'

'বেশ, তোমরা তাহলে গুঁপো আর দেড়ে-রাজার গল্প শোন

বসে। আমি অ্যালজেব্রার অঙ্ক কষি গিয়ে!'—মিনু রেগে উঠে যাচ্ছিল। ঠাকুরদা বললেন, 'শোন শোন, অত রাগ কিসের? গল্পটা শুনেই দেখ না শেষ পর্যন্ত।'

'আমার রাজার গোঁফ-দাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি আগে থেকে!'

'বেশ বেশ, তাই হবে।'

জগু বললে, 'মিনু তাহলে একাই গল্প শুনুক, আমরা চললুম। আয় রে নিপু, চল্ আমরা লুডোই খেলিগে।'

'আঃ, তোরা চুপ করে বোস দেখি, গল্পটা শোন্ই না শেষ পর্যন্ত।'

নিপু বললে, 'রাজার কিন্তু গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা চাই।'

'বেশ বেশ, তাই থাকবে। চুপ করে বোস আগে।'

আবার তিনজনে বসল তারা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুরদা শুরু করলেন:

'এক ছিল রাজা। রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল—'

নিপু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল—'বাঃ!'

জগু বললে, 'দুই-ই? অত্যন্ত সেকেলে রাজা তাহলে।'

মিনু ঠাকুরদাকে শাসিয়ে বললে, 'আচ্ছা দেখব, এবার কে তোমার আফিঙের কৌটো খুঁজে দেয়!'

ঠাকুরদা মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু মিনুর গায়ে ছোট্ট একটি চিমটি কেটে যা জানালেন, তার অর্থ—শোন্ না শেষ পর্যন্ত, আগে থাকতেই ছটফট করছিস কেন?

নিপু বললে, 'তারপর?'

ঠাকুরদা বললেন, 'তুমিই বল তোমার রাজা কী করবে। শিকার করবে, না ব্যবসা করবে, না অনাথ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করবে?'

নিপু বললে, 'শিকার। স্পোর্টসম্যান না হলে আর রাজা?'

ঠাকুরদা শুরু করলেন আবার:

'এক ছিল রাজা। তাঁর গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল। একদিন

সকালে উঠে গোঁফে তা দিতে-দিতে তাঁর মনটা কেমন হু-হু করে উঠল। মনে হতে লাগল, কী যেন করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। রাজা বিচলিত চিত্তে অন্দরমহলে গিয়ে বললেন, "রানী, আমার কী যেন করবার ছিল একটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না ; কী করি বল তো ?" রানী বললেন, "আমার শুকপাখিকে জিগ্যেস কর, সে উপায় বলে দেবে।" রানীর ছিল এক অদ্ভুত ধরনের শুকপাখি। গায়ে ময়ূরকণ্ঠী রঙ, ঠোঁট যেন প্রবাল দিয়ে তৈরি, চোখদুটিতে জ্বলছে চুনি। ল্যাজটি বেশ বড়, শুধু বড় নয়, ল্যাজের প্রত্যেকটি পালকে রামধনুর সাতটি রঙ ঝলমল করছে ! মনে হচ্ছে যেন ময়ূরকণ্ঠী পাহাড় থেকে রামধনু রঙের ঝরনা নেমেছে। রানীর মর্মর-মহলে সোনার দাঁড়ে দুলছিল সেই পাখি। রাজা গেলেন তার কাছে। গিয়ে বললেন, "শুকপাখি, একটু আগে গোঁফে হাত দিয়ে আমার মনে হল, কী যেন একটা করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। মনটা কেমন হু-হু করছে, কী করি বল দেখি ?" শুকপাখি বললে, "দাড়িতে হাত বোলাও, তাহলেই মনে পড়বে।" রাজা তখন দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, শিকারে বেরুতে হবে। রাজা দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে। এসেই মন্ত্রীকে হুকুম করলেন, "মন্ত্রিন্, আমি শিকারে বেরুব। সব ব্যবস্থা কর।" ··ঠাকুরদা চুপ করলেন।

জগু বললে, 'নিতান্ত সেকেলে ধরনের রাজা দেখছি !'

'তোমার একেলে রাজা কী করতেন শুনি ?'

'প্রথমত একেলে রাজার দাড়ি থাকত না, দ্বিতীয়ত শিকার করবার জন্যে তাঁর মন হু-হু করত না। একেলে রাজা প্লেনে চড়ে যেতেন কোরিয়ায় শান্তি স্থাপন করবার জন্যে, কিংবা—'

'খুব হয়েছে, থাম্।'

নিপু থামিয়ে দিলে জগুকে।

'তারপর ?'···মিনু জিগ্যেস করলে। গল্পটা তার ভাল লাগছিল।

'তারপর হাতিশালা থেকে বেরুল হাতি, ঘোড়াশালা থেকে বেরুল ঘোড়া। গুম গুম গুম গুম তোপ পড়তে লাগল। বড় বড় পালোয়ানেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাজার সঙ্গে শিকারে যাবে বলে। রাজা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীরভাবে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে জলদগম্ভীর স্বরে মন্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, "মন্ত্রিন্, এসব থামিয়ে দাও। আমি বীর, আমি একা শিকারে যাব। আমার পঞ্চলক্ষণ কালো ঘোড়াটিকে আনতে বল কেবল। তার উপর সওয়ার হয়ে আমি একাই বেরুব। চোলপুর জঙ্গলে ভীষণ একটা বাঘ এসেছে শুনছি। আমি একাই তাকে মারব।

'পঞ্চলক্ষণ কালো ঘোড়ায় রাজা একাই বেরিয়ে গেলেন। অন্দর-মহলে শুকপক্ষী রানীকে ডেকে বললেন, "রানী, রাজা আর ফিরবে না। এইবার তুমি আমার পিঠে চড়ে বস। আমি তোমাকে পরজন্মে নিয়ে যাব। সেখানেই রাজার সঙ্গে আবার দেখা হবে তোমার। আমি দেহ বাড়াচ্ছি, তুমি একটু ছোট হও।"

'শুকপক্ষী দেখতে দেখতে বিরাট গরুড়পক্ষী হয়ে গেল, আর রানী হয়ে গেলেন ছোট্ট একটি বেনী-দোলানো কিশোরী। অনেকটা আমাদের মিনুর মত—'

'ধেৎ!' মিনু ছোট্ট একটি চাপড় মারলে ঠাকুরদাকে।

'তারপর?' নিপুর সত্যিই এবার ভাল লাগছিল গল্পটা। জগুরও লাগছিল, যদিও সে চুপ করে ছিল।

'রানী শুকপক্ষীর পিঠে চড়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেলেন।'

'রাজার কী হল?'

'রাজা পঞ্চলক্ষণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ করে ছুটে চলেছিলেন চোল-জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। হাওয়াতে ফুরফুর করে তাঁর দাড়ি উড়ছিল, আর উড়ছিল শিরস্ত্রাণের পালকটি। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছিলেন তিনি। সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে চোল-জঙ্গলের কাছে এলেন যখন তিনি, তখন সন্ধ্যা

হয়ে গেছে। বাইরে থেকে চোল-জঙ্গলের চেহারা দেখে রাজার মত বীরের বুকটাও কেঁপে উঠল। আকাশ পর্যন্ত ঠাসা জঙ্গল, কোথাও একটু ফাঁক নেই ; মনে হচ্ছে, অন্ধকারের একটা বিরাট পাহাড় যেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা। তারপর পঞ্চলক্ষণকে সম্বোধন করে বললেন, "পঞ্চলক্ষণ, এই ভয়ঙ্কর চোল-জঙ্গলে ঢুকতে তোমার ভয় করবে না তো?"

'পঞ্চলক্ষণ উত্তর দিলে, "আপনার যদি ভয় না করে, আমারও করবে না।"

"ঢোকা কি উচিত?"

"আজ নাহয় কাল আমাদের ঢুকতেই হবে, কারণ, আমাদের পরজন্ম অপেক্ষা করে আছে ঐ অন্ধকারের ভিতরে।"

"তাহলে বিলম্ব করে লাভ কী?"

"কোন লাভ নেই।"

"চল তাহলে।"

'ঘাড় বেঁকিয়ে টগবগ-টগবগ করতে-করতে ঢুকে পড়ল পঞ্চলক্ষণ চোল-জঙ্গলের ভিতর। গভীর অরণ্য, ছোট-ছোট ঝোপে-ঝাড়ে বারবার গতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত অস্ফুট শব্দে শিউরে উঠছে অন্ধকার, পঞ্চলক্ষণ কিন্তু চলেছে নির্ভয়ে। এইভাবে অনেকক্ষণ চলবার পর আলো দেখা গেল একটু। পঞ্চলক্ষণ এগিয়ে চলল সেই দিকে। ঝোপঝাড় ভেদ করে শেষে হাজির হল একটা ফাঁকা জায়গায়, দেখলে, সেখানে দাউ দাউ করে মশাল জ্বলছে একটা। দাঁড়াতেই চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গর্জন হল—"হালুম!" তারপরই এক লম্ফে বেরিয়ে এল এক হাফ-প্যান্টপরা বিরাট বাঘ। এসেই পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা দিয়ে গোঁফ চুমরে, রাজাকে সম্বোধন করে বাঘ বললে, "তুমি চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে এসেছ?"

'রাজা বললেন, "হ্যাঁ।"

"মারো আমাকে। এই আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছি।"

'বাঘ পিছনের পা ছুটোতে ভর দিয়ে সত্যি-সত্যি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজার মনে হল, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি তাঁর তূণ থেকে সবচেয়ে মারাত্মক তীরটি বার করে ছুঁড়লেন। ঠিক বুকের মাঝখানে লাগলও গিয়ে তীরটি, কিন্তু হাফ-প্যাণ্টপরা বাঘের কিছু হল না। হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠল সে। তারপর থাবা দিয়ে তীরটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে বুক থেকে, মনে হল যেন ছোট একটা মাছি তাড়িয়ে দিলে। রাজা আবার একটা তীর ছুঁড়লেন, আবার সেই ব্যাপার! ফের একটা ছুঁড়লেন, ফের সেই কাণ্ড! রাজা তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঘের কিছু হচ্ছে না। বাঘ প্রত্যেকবারই হা-হা করে হাসছে, আর থাবা দিয়ে তীর ঝেড়ে ফেলছে।

'শেষকালে রাজার সব তীর ফুরিয়ে গেল।

'হাফ-প্যাণ্টপরা বাঘ আবার অট্টহাস্য করে উঠল :

"তোমার তীর তো ফুরিয়ে গেল, রাজা—এইবার তলোয়ার বার কর। আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

'রাজা রাগে গরগর করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে কামার তীরগুলো বানিয়েছে, সে তীরে শান দেয়নি ভাল করে। এবার গিয়ে তাকে শূলে চড়াতে হবে। তলোয়ারটার উপর কিন্তু তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। এক পারসী ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নিজে পছন্দ করে তিনি কিনেছিলেন তলোয়ারটা। ক্ষুরধার তলোয়ার। খাপ থেকে সড়াৎ করে সেটা বার করে পঞ্চলক্ষণের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন রাজা।

'হাফ-প্যাণ্টপরা বাঘ ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজার মুখের দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে বললে, "চালাও তোমার তলোয়ার। যত জোরে পার কোপ মার।"

'রাজা মারলেন কোপ।

'তলোয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাজা নির্বাক নিরস্ত্র

হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঘ আবার হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর রাজার দিকে ফিরে বলল, "রাজা, তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। আমার এ বিশ্বাস আছে বলেই তোমার সামনে আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি। দোষ তোমার অস্ত্রের নয়।"

' "কিসের তবে ?"

' "তোমার দাড়ির।"

' "দাড়ির ?"

' "হ্যাঁ, দাড়ির। যতক্ষণ তোমার দাড়ি আছে, ততক্ষণ তুমি আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। মহর্ষি জগুর শিষ্য আমি। তিনি তপস্যাবলে জেনেছিলেন যে দাড়িওলা রাজারা প্রায়ই বাজে-মার্কা হয়, তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, দাড়িওলা কোনও রাজা যদি তোমাকে মারতে আসে তাহলে তুমি নির্ভয়ে গিয়ে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পার, সে তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।"

জগু নিপুর কানে ফিসফিস করে বললে, 'ঠাকুরদার আফিঙের নেশাটা বেশ জমে এসেছে এবার।'

মিনু রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সে বললে, 'তারপর ?'

ঠাকুরদা অর্ধ-নিমীলিত নয়নে বলতে লাগলেন, 'হাফ-প্যান্ট পরা বাঘের মুখে এই কথা শুনে রাজা তো অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তিনি জিগ্যেস করলেন, "মহর্ষি জগু তো একজন মহাজ্ঞানী লোক। তুমি বাঘ হয়ে কী করে তাঁর শিষ্য হলে ?" বাঘ বললে, "আমি বাঘ নই, আমি মানুষ। খাকি হাফ-প্যান্ট পরে চুরি করে বেড়াতাম। মহর্ষি জগু তাই রেগে একদিন অভিশাপ দিয়ে আমাকে বাঘ করে দিয়েছিলেন। আমি বাঘ হয়ে গেলাম, কিন্তু আমার খাকি হাফ-প্যান্টটা কিছুতেই খুলল না। সুতরাং বাঘেরাও আমাকে একঘরে করলে। বললে, "প্যান্ট-পরা বাঘকে আমরা সমাজে স্থান দেব না।" তখন মহর্ষি জগুকে একদিন গিয়ে মিনতি করে বললাম, "প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন এবার। আবার মানুষ করে দিন। এই

হাফ-প্যাণ্টের জন্যে বাঘেরাও আমাকে সমাজে নিচ্ছে না।" মহর্ষি জগু তখন বললেন, "যদি কোনদিন কোনও দেড়ে রাজা চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে আসে, তাহলে তার সামনে তুমি গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে।" আমি বললাম, "যদি সে আমাকে মেরে ফেলে ?" মহর্ষি বললেন, "দেড়ে রাজারা অতিশয় বাজে-মার্কা রাজা হয়, তারা তোমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু যদি কখনও এমন কোনও রাজা আসে যার গোঁফ আছে অথচ দাড়ি নেই, সেই রাজার পায়ের ধুলো নিলেই তুমি আবার মানুষ হয়ে যাবে। এরকম রাজার যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে আমার আশ্রমে নিয়ে এস। তাঁকে দিয়ে আমার একটু কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

'রাজা প্রশ্ন করলেন, "মহর্ষি জগুর আশ্রম এখান থেকে কত দূর ?"

' "কাছেই।"

'রাজা একটু ইতস্তত করছিলেন যে, সত্য কথাটা প্রকাশ করে বলবেন কি না।

'পঞ্চলক্ষণ বললে, "মহারাজ, সত্য কথা প্রকাশ করে বলুন।"

'রাজা তখন টান মেরে দাড়িটা খুলে ফেলে বললেন, "দেখ, এ দাড়ি আমার নিজের দাড়ি নয়। আমার গুরুদেব মহর্ষি নিপুর আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পরে থাকতে হয়। রাখবার মত দাড়ি আমার হয় নি, কিন্তু মহর্ষি নিপুর ধারণা দাড়ি না থাকলে রাজাকে মানাবে না, তাই তাঁরই আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পরে থাকতে হয়েছে।"

'বাঘ বললে, "মহারাজ, তাহলে এইবার আমাকে পদধূলি দিন, আমি আবার মানুষ হই।"

'রাজা জুতো-মোজা খুলে মাটিতে পা ঘসে পায়ে খানিকটা ধুলো লাগিয়ে নিলেন (রাজার পায়ে ধুলো থাকবে কী করে), তারপর সেই ধুলো বাঘের মাথায় দিতেই বাঘ মানুষ হয়ে গেল। ছোট, বেঁটে, কালো কুচকুচে চেহারার একটি মানুষ।

'সে সবিনয়ে বললে, "আমার নাম রংলাল। চলুন, এইবার আপনাকে মহর্ষি জগুর আশ্রমে নিয়ে যাই।"

নিপু মুচকি-মুচকি হাসছিল, এইবার হো হো করে হেসে উঠল।

'সত্যি দাদু, তোমার আফিঙের নেশাটা আজ জমেছে ভাল।'

মিনু বললে, 'আঃ চুপ কর্ না। তারপর কী হল দাদু?'

ঠাকুরদা বললেন, 'মহর্ষি জগুর আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। মহর্ষি জগু তখন ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন। রংলালের মুখে সব কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার মতই একজন লোক আমি খুঁজছিলাম। কোরিয়াতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়েছে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে শান্তি স্থাপন করতে। তাদের শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে যে—দেখ বাছারা, দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়, পাঁচ কিংবা ছয় কখনও হয় না। এই কথাটি মেনে নিয়ে তোমরা শান্ত হও। রাজা বললেন, 'কোরিয়ায় যাব কী করে?' মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরে ঢুকে ছোট্ট একটি রেডিও নিয়ে এলেন। বাইরের বারান্দায় একটা গামলায় টগবগ করে জল ফুটছিল, মহর্ষি রেডিওটি সেই ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই রেডিও-সিদ্ধ জল একটু খেলেই তুমি যে-কোন ভাষায় কথা কইতে পারবে।' তারপর তিনি রাজার মাথায় ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলেন। দেখতে-দেখতে রাজার চেহারা গেল বদলে। দেখতে-দেখতে তিনি ছিপছিপে একটি যুবক হয়ে গেলেন। কুচকুচে কালো গোঁফ, চমৎকার টানা টানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল। ঠিক অনেকটা মিনুর বিমল-দার মত—'

'বাজে কথা বলবেন না, বিমলদার গোঁফ নেই!' ফোঁস করে উঠল মিনু—'তারপর কী হল বলুন।'

'তারপর মহর্ষি জগু পঞ্চলক্ষণের কপালেও চন্দনের একটি টিপ দিলেন। পঞ্চলক্ষণ সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে গেল একটি ছোট্ট এরোপ্লেন। মহর্ষি

তখন বললেন, "এই যে রংলালকে দেখছ, এ একজন ভাল পাইলট। কিন্তু গত যুদ্ধে গিয়ে নানারকম কুসঙ্গে পড়ে লোকটা গুলি খেতে শিখল। ফলে কিছুদিন পরে চাকরি গেল। গুলির পয়সা জোটে না, লোকের পকেট মেরে বেড়াতে লাগল শেষটা। মানে ছিঁকচে চোর হয়ে দাঁড়াল একটি। একদিন দেখি, আমার গাড়ুটা নিয়ে পালাচ্ছে। রেগে আমি ওকে বাঘ করে দিলুম। তারপর যা যা হয়েছে তা তো তুমি জানই। রংলালের পথঘাট সব জানা আছে, সে তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে কোরিয়ায় পৌঁছে দেবে ঠিক। ওর সঙ্গে নির্ভয়ে রওনা হয়ে পড় তুমি।"

'প্লেন আকাশে উড়ল। উড়ছে তো উড়ছেই। কত দিন, কত রাত্রি যে পার হয়ে গেল তার ঠিক নেই। মাথার উপরে আকাশ কখনও নক্ষত্রে ভরা, কখনও জ্যোৎস্নাময়, কখনও মেঘে ছাওয়া, কখনও রোদে উজ্জ্বল—আসছে আর চলে যাচ্ছে। আর পায়ের নিচে পৃথিবীরও রূপ বদলাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে—নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, গ্রাম, নগর, শস্যশ্যামল মাঠ কত যে এল আর গেল! গর্‌র্ গর্‌র্ উড়ে চলেছে প্লেন, যে প্লেন একটু আগে ছিল পঞ্চলক্ষণ ঘোড়া।

'হঠাৎ রংলাল প্লেনের মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। রাজা বললেন, "প্লেনটা ঘোরালে যে?"

'রংলাল কিছু না বলে হাসিমুখে রাজার দিকে চাইলে কেবল একবার। রাজা আর কিছু বললেন না, তাঁর মনে হল, কোরিয়া যাবার রাস্তাই বুঝি এইটে।

'খানিকক্ষণ পরে রংলাল বললে, "ঐ যে নীল আকাশের গায়ে কালো মত একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, দেখতে পেয়েছেন?"

' "হ্যাঁ, কালো মেঘ একটা।"

' "মেঘ নয়, পাহাড়, আফিঙের পাহাড়।"

' "তাই নাকি?"

' "ওখান থেকে এক-চাঙড় আফিং তুলে নেব ভাবছি। কোরিয়ায়

ডামাডোল এখন, আফিং পাওয়া যাবে কি না কে জানে, কিছু সংগ্রহ করে রাখাই ভাল।"

'বোঁ বোঁ করে প্লেন উড়ে চলল আফিঙের পাহাড়ের দিকে। কাছাকাছি আসতেই রাজা দেখতে পেলেন, কালো পাহাড়ের নিচে প্রকাণ্ড একটা কার্পেটের মত কি যেন বিছোনো রয়েছে।

'রংলাল বললে, "আফিঙের ফুল ফুটেছে। এই পাহাড়ের চারিদিক ঘিরে আছে আফিঙের বন। বারো মাস, তিরিশ দিন ফুল ফোটে। মায়াবিনী রাজকন্যার রাজত্ব কিনা এটা! আমি টুপ করে নেমে, চট করে নিয়ে আসি খানিকটা আফিং, তারপর একেবারে সোজা পাড়ি দেব কোরিয়ার দিকে।"

'আফিঙের বনের পাশে নামল প্লেন। রংলাল প্লেন থেকে নেমে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজাও নামলেন। নেমেই কিন্তু রাজা অপূর্ব একটা গন্ধ পেলেন। চারিদিকের বাতাস সেই গন্ধে যেন ভারী হয়ে রয়েছে। অদ্ভুত সে গন্ধ, চমৎকার! রাজা আচ্ছন্নের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, কী সুন্দর! কী অপূর্ব! ক্রমশ তাঁর ঘুম পেতে লাগল। ভাবলেন প্লেনের ভিতর ঢুকেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক ঠেস দিয়ে। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, প্লেন নেই, প্রজাপতি হয়ে সেটা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে আফিঙের ফুলে ফুলে। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে চেয়ে রইলেন রাজা। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। আফিঙের ফুলগুলো একটা যেন আর-একটার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল, দেখতে দেখতে সমস্ত ফুলগুলো এক হয়ে গেল আর তার থেকে বেরিয়ে এল এক রাঙা পরী, তার হাতে একটি বাঁশি। সে রাজাকে এসে বললে, "রাজা, এই বাঁশি নাও, আর বাজাতে-বাজাতে চল আমাদের রাজকন্যার কাছে।" রাজা জিগ্যেস করলেন, "কে সেই রাজকন্যা?" পরী বললে, "মায়াবিনী রাজকন্যা, নাম তাঁর মীনাবতী। চল তাঁর কাছে।" রাজা বললেন, "বেশ, চল।" পরীর সঙ্গে সঙ্গে রাজা চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে একটা পুকুর

দেখা গেল। পুকুরের ধারে এসে পরী বললে, "রাজা, এইবার একটি কাজ করতে হবে। এই নাও সেফটি রেজর। ঐ পুকুরের আয়নার সাহায্যে তোমার গোঁফটি কামিয়ে ফেল। মীনাবতী রাজকন্যা গোঁফ পছন্দ করেন না।"

'পুকুরের পাড়ে বসে পুকুরের স্বচ্ছ জলে রাজা নিজের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সেফটি রেজর দিয়ে গোঁফ কামিয়ে ফেলতে দেরি হল না।

'তারপর রাজা বাঁশি বাজাতে বাজাতে চললেন মীনাবতী রাজকন্যার উদ্দেশে।'

মিন্নু বললে, 'ধেৎ!'

এমন সময় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

জগু বললে, 'ঐ বোধহয় আমাদের নিতে মোটর এল।'

মোটর থেকে নামলেন মিন্নুর বাবা। তিনি ঠাকুরদাকে বললেন, 'আপিস থেকে একটা ট্যাক্সি করে সোজা এইখানেই আগে চলে এলাম, ভাবলাম, তোমাকে সুখবরটা দিয়ে যাই। বিমলের সঙ্গে মিন্নুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ওদের মত হয়েছে, বিমলের বাবা টেলিগ্রাম করেছেন। একটু আগে আপিসেই পেলাম টেলিগ্রামটা।

মিন্নু উঠে এক ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

বন্য মহিষ

এক

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমনিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমনি-পত্নী সুলোচনা লোচনদুটি রক্তবর্ণ করে বসে আছেন রেগে। নীলমনিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে। বৌদি দাদার নামে যেসব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেকা সম্ভব নয়।

···ঘড়িতে ঢং করে যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, 'কাণ্ডখানা দেখেছ তোমার দাদার! তাও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাড়-হাবাতে মাছের ব্যবসা করবে, তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারা জীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা—'

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাটকা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, 'ওগো, শুনছ, ফাস্টক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল, ঝাল করে ফেল দিকি মাছগুলোর—'

'এখন, এত রাত্রে? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই?'

'আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে? আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায়?'

মায়া বললে, 'আমি সব করে দিচ্ছি।'

দুই ভাইবোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে। যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যিই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমনিবাবু সারা জীবন ধরে এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিলদরিয়া স্বভাব যে, বিশ্বের যাবতীয় লোককে দুহাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেয়ে অনেক বনের মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে। আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

দুই

একবার অসুস্থ হয়ে কলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হল নীলু-বাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ-দুই টাকা ধার করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা খড়ের ঘরে। যে ডাক্তারবাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার-দুই ডেকেই

নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তারবাবুকে নিজের অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ঐটেই এখন চলুক—'

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তার একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিঙে। গ্রামে হাই স্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে ছিল সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমনির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমনি বললেন, 'জগুকে নাহয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কলকাতা শহরে—'

সুলোচনা বললে, 'জগুই বা কলকাতা শহরের কী চেনে? সেও তো কখনও আসে নি।'

'তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দুদিনেই চিনে নেবে।'

'তাহলে জগুকে লিখে দাও, সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কলকাতায় আসে নি, হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলির গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে?'

'আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সে-ই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

নীলমনিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এর পরেই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হয়ে উঠল। নীলমনিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে হেদো পর্যন্ত যাবেন। হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, 'ট্রামটা এলেই টপ করে উঠে পড়বি। ট্রাম

বেশিক্ষণ থামবে না। ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে পড়ল, কিন্তু চড়তে পারলেন না নীলমনিবাবু। তিনি তুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভিড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, 'পরের স্টপেজে নেমে পড়িস জগু।' জগু সেকথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাকটার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশাহারা হয়ে পড়ল বেচারি। কেবল আশা করতে লাগল, বাবা হয়ত পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্যুপরি তিন-চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমনিবাবু আসতেন কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে উঠতেই সাহস করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন, জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, ক্রমশ রাত্রি আটটা বাজল তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমনিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন। তু-চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, 'আপনি বাড়ি যান, যদি কোন খবর আসে আমি আপনাকে বলে আসব। চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে। হয়ত একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।'

'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই, খবর পেলে দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সেকথা আর বলতে ?'

রাত দশটা পর্যন্ত জগু এল না। নীলমনিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। তুজনেই কাতরভাবে ভগবানকে ডাকছিলেন, আর কিছু করবার ছিল না।

তিন

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করলে। যখন অন্ধকার হয়ে এল, তখন তার মনে হল, এবার বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে ? 'সরকার বাই লেন' নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোন্‌খান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই ! ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম-কণ্ডাকটার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে খানিকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্সা চড়ে গেলে কেমন হয় ? ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্সাওয়ালাকে জিগ্যেস করলে, 'সরকার বাই লেন চেন ?'

'খুব চিনি, আস্থন।'

রিক্সা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হল সে ঠিক উল্টো দিকে চলছে। বলল সেকথা। কিন্তু রিক্সাওয়ালা ধমকে উঠল—'ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বইসে থাকুন না।'

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে বসে রইল। তার মনে হল, কোন শর্টকাট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়ত। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই লেন নয়, তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সেরকম নয়।

'এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?'

'এই তো শাঁখারিটোলা লেন।'

'আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব !'

'সরকার বাই লেন কোথা ? তখন বললেন শাঁখারিটোলা এখন অন্য বাত বলছেন !'

'সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।'

'সরকার বাই লেন কোথায় আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সওয়ারি করে যান।'

'আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল, তখন পয়সা দেব।'

'সরকার বাই লেন আমি চিনি না।'

বচসা শুরু হল। কলকাতার রিক্সাওয়ালারা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও নিরুপায়। কথা-কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

'কী হয়েছে খোকা—'

জগুর চোখে তখন জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

'ও, তুমি এই প্রথম কলকাতায় এসেছ বুঝি? কোথায় বাড়ি তোমার?'

'মানসই। পুর্নিয়া জেলায়।'

'ও। তোমার বাবার নাম কী?'

'নীলমনি মুখোপাধ্যায়।'

'নীলমনিবাবুর ছেলে তুমি? এস, এস।'

ভদ্রলোক রিক্সাওয়ালাকে বিদায় করলেন। তারপর বললেন, 'সরকার বাই লেন কোথায়, তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।'

জগুর ক্ষিদে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই লেনের পাত্তা লাগালেন।

'এইবার চল, তোমাকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে আসি।'

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারাজ থেকে।

দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন তিনি নীলমনিবাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময়।

'চিনতে পারেন আমাকে ?'

নীলমনিবাবু চিনতে পারলেন না।

'সেই যে, মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে ? সেই যে, বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই ?'

নীলমনিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

'আপনার আশীর্বাদে মাছের ব্যবসা করে ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই প্রথম আমার হাতে খড়ি। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা ! এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে ? কোন্ ডাক্তার দেখছে ?'

'ডাক্তার এস. কে. মিত্র।'

'আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার। এটি কে ? মেয়ে ? বাঃ, চমৎকার দেখতে তো ! বিয়ে হয় নি দেখছি। সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা, সে-সব কথা পরে হবে এখন। এখন সেরে উঠুন।'

নীলমনিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমনিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশি বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হল, যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। উক্ত মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য হতেন। ভদ্রলোক মাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে !

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

চার

কলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাসছয়েক পরে একদিন

নীলমনিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতে ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ, মহাদেববাবু আসন্ন-প্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময় জনদুই কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, 'দিন-সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো ? খদ্দরধারা দুটি ছোকরা—'

'তারা পলিটিক্যাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'চলুন।'

হাত ধুয়ে তিনি পুলিশদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তার জেল হল এবং জেলে মৃত্যুও হল।

পাঁচ

পাঁচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

'চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল ! আর, বাড়িতে কোনও লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই। জগুরও চাকরি হয় নি।'

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হয়ে এসে ঢুকল।

'মা, আমার চাকরি হয়ে গেল ! অনেক ভাল ভাল ক্যাণ্ডিডেট

ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কী করে হল জান? সেই যে দুটো লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল, যার জন্যে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিস্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন, "ও, তুমি নীলমনিবাবুর ছেলে? তোমাকে নিশ্চয়ই নেব! তোমার বাবা সেদিন আশ্রয় না দিলে হয়ত ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বোস, বোস—" খুব আদর-যত্ন করলেন, তারপর বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।"

সুলোচনা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

ঠাকুমার বৈঠকে

ছুটির সময় একপাল ছেলেমেয়ে জুটেছিল বাড়িতে। কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। তবে গানে গল্পে বাড়ি একেবারে মশগুল। সেদিন হঠাৎ রাজারানীর বিষয়ে তর্ক উঠে প'ড়ল ঠাকুমার বৈঠকে।

ষোল বছরের ফন্‌তি সবে কলেজে ঢুকেছে।

সে বেণী দুলিয়ে মন্তব্য করলে, 'যাই বল তোমরা, কুইন ভিক্টোরিয়ার মত রানী কখনও হয়নি, আর হবেও না।'

ফন্‌তির সমবয়সী শান্তা ঠোঁট উল্টে বললে, 'বাজে কথা বলিস নি। রানীর মত রানী ছিল এলিজাবেথ, যাকে স্প্যানিশ আর্মাডা সামলাতে হয়েছিল। ঘরে বাইরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে নিজের মাথা উঁচু করে রেখেছিল যে, তার সঙ্গে কোনও রাজারই তুলনা হয় না তো কুইন ভিক্টোরিয়া—'

জগু প্রতিবাদ করল এইবার।

'থাম থাম! ওঁরা সব নামেই রানী। ওঁদের প্রত্যেকের পিছনে জাঁদরেল জাঁদরেল পুরুষ মন্ত্রী ছিলেন। রাজা ছিলেন অ্যাফফ্রেড দি গ্রেট, উইলিয়ম দি কঙ্কারার, রিচার্ড দি লায়ন-হার্টেড। নাম করতে হলে এঁদের নাম করা উচিত—'

বিলু বলে, 'ফ্রান্সের লুই, রাশিয়ার আইভ্যান এরাই কম কী—'

ফন্‌তি হঠবার পাত্রী নয়।

সে বললে, 'তোমাদের গলার জোর আছে চেঁচিয়ে যাও, কিন্তু এটা ঠিক জেনে রেখো পৃথিবীর সব রাজা-রানীর সেরা হচ্ছে কুইন ভিক্টোরিয়া।'

বিমল তার দিকে চেয়ে এক লাইন গানই গেয়ে দিলে—'রাজারানীর সেরা সে যে ভিক্টোরিয়া রানী। আচ্ছা, মেনে নিলাম। ভাল করে চা কর দিকি—'

'আমি একা পারব না এত কাপ চা করতে। শান্তা তুই চল—'

ফন্তি আর শান্তা চলে গেল।

জীবু এতক্ষণ কিচ্ছু বলে নি, বিলুর দিকে চেয়ে এইবার সে বললে, 'তুমি ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি, স্ট্যালিন এদের রাজা বলবে না?'

বিলু বললে, 'না। ওরা জাতে আলাদা। জবাফুল যত ভাল আর যত বড়ই হোক আর গোলাপ ফুল কিছুতেই বলা চলবে না।'

বিলু বি. এ. পড়ে। তার ভাবভঙ্গি একটু ভারিক্কি গোছের।

'ওদের কী বলবে তাহলে?'

'ইংরিজিতে ডিক্টেটর বলে। বাংলায় ডাকাতের সর্দার বললে খুব অন্যায় বলা হবে না।'

বারো বছরের মিনি বলে উঠল, 'আমাদের ইতিহাসে কিন্তু যেসব রাজাদের নাম আছে তার তো একটাও বলছ না মেজদা! রামেসিস, ইথনাটন, হাম্মুরাবি, সীজার, নিরো—'

'এসব তোদের পড়াচ্ছে নাকি আজকাল?'

'আমাদের বিশ্বের ইতিহাস পড়তে হয় যে।'

'ও বাবা, তা তো জানতাম না!'

মিনির দাদা রমু বললে, 'আমাদের দেশের রাজাদের নামও তো করলে না তোমরা। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে দেবপাল, ধর্মপাল, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত কত ভাল ভাল রাজা হয়েছে আমাদের দেশে।'

বিলু ধমকে উঠল।

'থাম থাম ডেঁপো কোথাকার! হিস্ট্রিতে লেটার পেয়ে ভেবেছিস

খুব একটা দিগগজ হয়েছিস, না? ভারতবর্ষের ওসব রাজারা হচ্ছে, রূপকথার রাজা।'

রমু ভাল ছেলে, স্কলারশিপ পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছে, বিলু তা পারেনি, তাই রমুর উপর বিলুর হিংসে আছে একটু।

রমু কিচ্ছু না বলে চুপ করে গেল। দাদার মুখের উপর উত্তর দেওয়া যে অনুচিত, এ জ্ঞান তার আছে।

বিমল কিন্তু রমুর হয়ে জবাব দিলে, রমু ঠিকই বলেছে। আমাদের দেশের রাজারাই আদর্শ রাজা। রূপকথার রাজা মানে? অশোক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল এরা সব রূপকথার রাজা?'

বিলু মুখ বেঁকিয়ে মুচকি হেসে বললে, 'প্রায় তাই।'

দীপ্তি বিমলের দিকে চেয়ে হাসল একটু। বিলুর ছোট মাসি সে। বি. এ. পড়ছে।

'বিলুকে বেশি ঘাঁটিয়ো না। ও মস্ত লায়েক হয়েছে। এখুনি হয়ত বলে বসবে সুরেন বাঁড়ুজ্জে, চিত্তরঞ্জন, গান্ধি, নেহেরু এরাও রূপকথা।'

বিলু কলেজে পড়ে বটে, কিন্তু এখনও বেশ ছেলেমানুষ আছে।

সে নাকে কেঁদে ঠাকুরমার দিকে চেয়ে বললে, 'দেখ না ঠাকুমা ছোট মাসি রাগাচ্ছে আমাকে—'

ঠাকুমা আফিং খেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন বসে। কিন্তু এদের কথা শুনছিলেন সব।

বললেন, 'তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আসল রাজাদের তো নামই করলে না কেউ।'

'আসল রাজা মানে?'

'যারা পৃথিবীতে প্রথম রাজা হয়েছিল।'

ঠাকুমার দিকে অবাক হয়ে চাইল সবাই। ঠাকুমা আবার কী বলে!

ঠাকুমা সেকেলে লোক হলেও মূর্খ নয়। সে যুগেও বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। তা ছাড়া সেদিন পর্যন্ত কাগজে কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন।

তাঁর কথা তুচ্ছ করবার মত নয়। ঠাকুমা কী বলেন তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল সবাই। ঠাকুমা কিন্তু কিছু বললেন না, নিমীলিত নয়নে হাসিমুখে বসে রইলেন।

'কোন্ রাজার কথা তুমি বলছ ঠাকুমা?'

'পৃথিবীর প্রথম রাজাদের কথা।'

'কোন্ বইয়ে আছে তাদের খবর?'

'কোনও বইয়ে নেই।'

'কোথায় আছে তাহলে?'

'তারা আমার ভাঁড়ার ঘরে আছে।'

ঠাকুমা বলে কী! হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

'তোমার ভাঁড়ার ঘরে!'

ঠাকুমা হাসিমুখে বললেন, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভাঁড়ার ঘরে। তোমরাও চেন তাদের, কিন্তু জান না। তোমরা কেতাবি কথা মুখস্থ করতেই ব্যস্ত।'

ফন্‌তি আর শান্তা ফিরে এল।

ফন্‌তি বললে, 'দুধ কেটে গেছে, চা হল না। কারু এসে দুধ দুইবে তারপর চা হবে।'

'আচ্ছা তাই হবে না-হয়। তোরা বোস, ঠাকুমা মজার কথা বলেছেন একটা। পৃথিবীর প্রথম রাজারা নাকি ওঁর ভাঁড়ার ঘরে বন্দী হয়ে আছেন।'

শান্তা ঠোঁট টিপে হাসল একটু।

ফন্‌তি গিয়ে ঠাকুমার পাশে বসে তাঁর গলা জড়িয়ে বললে, 'কতটা আফিং আজ খেয়েছ ঠাকুমা—'

'সরে বোস মুখমুড়ি! গায়ে আমানির মত গন্ধ ছাড়ছে। কী যে সব ছাইপাঁশ মাখিস তোরা আজকাল—'

ফন্‌তি হেসে বললে, 'কাল তোমাকেও মাখিয়ে দেব। তোমার টুকটুকে রং আরও টুকটুকে হয়ে যাবে।'

বিমল ধমকে উঠল।

'ঠাকুমাকে গল্পটা বলতে দে না। এই ফন্‌তি, সরে বোস ওখান থেকে।'

ঠাকুমা ফন্‌তিকে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'থাক্ না, বেশ তো বসে আছে। তোর যদি হিংসে হয় তুইও নাহয় এপাশে এসে বোস।'

'আমি এখানেই বেশ আছি। পৃথিবীর প্রথম রাজাদের গল্পটা বল শুনি। সবচেয়ে প্রথম রাজা কে?'

ঠাকুমা মুচকি হেসে বললেন, 'বেগুন।'

'বেগুন!'

হাসির ধুম পড়ে গেল আবার।

হাসি থামলে ঠাকুমা বললেন, 'গোড়া থেকে শোন তবে। পৃথিবী এককালে ঘোর অন্ধকার ছিল। লক্ষ লক্ষ বছর অন্ধকারে কেটেছে। তারপর সেই অন্ধকার ক্রমশ বেগুনি হয়ে গেল। সব বেগুনি। আকাশ বাতাস গাছপালা সব বেগুনি। তখন জন্তু-জানোয়ার মানুষ-টানুষ কিছু জন্মায় নি। চারিদিকে জল আর গাছপালা। সেই যুগে একটি ছোট গাছে একটি ফল ফলল, তার রঙও বেগুনি। সে-ই হল রাজা। সে-ই হচ্ছে বেগুন। প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগল বেগুন। হুকুম জারি করে দিলে, যার রঙ বেগুনি নয় সে রাজসরকারে কোনও চাকরি পাবে না। হাজার হাজার বছর এই আইন চলল। কিন্তু এরকম অত্যাচার বেশিদিন চলতে পারে না। বেগুনি রঙকে আক্রমণ করল ঘন-নীল রঙ। অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলল। যুদ্ধে ঘন-নীল জিতল। বেগুনি রঙকে দূর করে দিয়ে ঘন-নীলের রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। ঘন-নীলের রাজত্বকালে রাজা হয়নি, রানী হয়েছিল। তার নাম অপরাজিতা। ভাঁড়ার ঘরের মা কালীকে যে অপরাজিতা দিয়ে পুজো করি রোজ, সেই অপরাজিতা। ছোট্ট ঐটুকু ফুল তো, কিন্তু কী যে প্রতাপ ছিল তার সেকালে! সমস্ত

পৃথিবী ঘন-নীল করে দিয়েছিল। কিন্তু কোন-কিছুই চিরকাল থাকে না, ঘন-নীলের রাজত্বও রইল না। নীল এসে হারিয়ে দিল তাকে। নীলেদের সঙ্গে আপোষ করে অপরাজিতা একটু ফিকে হয়ে গেল। কিছুদিন রানীও রইল সে।

কিন্তু নীল আকাশই রাজা হল শেষ পর্যন্ত। আকাশের সঙ্গে কি এইটুকু ফুল পারে? কিন্তু নীলের রাজত্বও বেশিদিন থাকেনি। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে তখন গাছপালাই বেশি। গাছপালাদের সবুজ রঙ জোট পাকিয়ে বিদ্রোহ করলে নীলের বিরুদ্ধে। তারাই জিতল শেষকালে। তারাই প্রথমে শাসন-পরিষদ তৈরি করে—যাকে তোমরা এখন পার্লামেণ্ট বল। সবুজ শাসন-পরিষদ। পালং শাক থেকে আরম্ভ করে বটগাছ পর্যন্ত সবরকম সবুজ-পাতা-ওলা গাছ থাকত সে সবুজ পরিষদে। ভোট নিয়ে ঠিক হত কে প্রধান মন্ত্রী হবে। যে পালং শাকের চচ্চড়ি তোমরা রোজ খাও সে-ই প্রধান মন্ত্রী হয়েছিল একবার। অনেকদিন রাজত্ব করেছিল এরা। কিন্তু একটা জিনিস প্রথমে এদের মাথায় ঢোকে নি, সবুজ চিরকাল সবুজ থাকে না, একটু বুড়ো হলেই হলদে হয়ে যায়। তখন ঠিক হল, যেসব সবুজ প্রবীণ হয়ে হলদে হয়ে গেছে তারা রাজত্ব করুক। পাকা কলা, পাকা লেবু, পাকা আম, পাকা পেয়ারা, অনেক রকম হলদে পাকা পাতা এরা তখন শাসন-পরিষদ জাঁকিয়ে বসল এসে। কমলালেবুরা বললে— 'আমরা হলদে হইনি বটে, কিন্তু আমরাই বা কম কিসে! আমরাও তো পাকা, আমরাও রসে ভরপুর, আমাদের বাদ দেবে কেন?'

মহা আন্দোলন শুরু করলে তারা। শেষ পর্যন্ত জিতেও গেল। কমলা রঙই সিংহাসন দখল করে রইল কিছুদিন। কিন্তু সব ফল পাকলে হলদে বা কমলা রঙ হয় না। লালও হয় অনেকে। তারা বললে, 'বা রে, আমরা বাদ পড়ব কেন তাহলে?' লঙ্কা আর তেলাকুচো ফল দল পাকাতে লাগল। রাঙা জবা, রঙ্গন, পলাশ, এরাও সব দলে ভিড়ে গেল। শেষে ভোটেও জিতল তারা। তারাও

রাজত্ব করল কিছুদিন। ত্নুনিয়া লালে লাল হয়ে যাবার উপক্রম হল, তখন অন্য রঙেরা ক্ষেপে উঠল আবার। মহা হট্টগোল বাধল একটা। তাদের হট্টগোলে দেবতারা চটে গেলেন। পাঠিয়ে দিলেন তোদের ঠাকুরদাকে—

'ঠাকুরদাকে!' সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তিনি এসে গপাগপ করে সব রঙগুলোকে গিলে ফেললেন। আপদের শান্তি হল। কিন্তু তিনি নিজে বিপদে পড়ে গেলেন। অতগুলো রঙকে হজম করা কি সহজ কথা! তিনি ছিলেন লম্বা, পট্ করে গোল হয়ে গেলেন। আর গা থেকে তেজ আর আলোর ছটা বেরুতে লাগল। তারপর বনবন করে ঘুরতে লাগলেন। আজও ঘুরছেন। দিবারাত্রি ঘুরছেন। এই চলছে এখন।'

ঠাকুমা চুপ করলেন। ঠাকুরদার কথা উঠে পড়াতে বাকি সকলেও চুপ করে রইল। বছর-তুই আগে ঠাকুরদা মারা গেছেন। ঠাকুরদার সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলেন ঠাকুমা। যা বলেন সব সত্যি বলে মেনে নিতে হয়। যৌবনে ঠাকুরদা নাকি গোটা কাঁঠাল, গোটা পাঁঠা খেতে পারতেন। দশ-বিশ ক্রোশ পায়ে হেঁটেই চলে যেতেন। কাকে যেন এক থাপ্পড় মেরেছিলেন, তিন দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল সে। শহর থেকে সায়েব ডাক্তার এনে তবে নাকি তার জ্ঞান ফেরানো হয়।

এ ঠাকুরদাকে অবশ্য নাতি-নাতনিরা দেখে নি। তারা দেখেছিল পুরু-লেন্সের-চশমা-পরা রোগা লম্বা এক বৃদ্ধকে। দিনরাত গীতা খুলে বসে থাকতেন। তবে, খেতে পারতেন। রোজ ক্ষীর খেতেন এক বাটি। ঠাকুরদার সম্বন্ধে ঠাকুমা অনেক আজগুবি গল্প বানিয়ে বলেন, আর সেসব বিশ্বাস না করলে মনে-মনে তুঃখও পান। সবাই ভাবলে, সেইরকম বানানো গল্প এটা, আফিঙের ঝোঁকে আরও অদ্ভুত করে ফেলেছেন।

জিতেন এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, একটি কথাও বলে নি। সে আই. এস. সি. পড়ে। সে হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

'বুঝেছি বুঝেছি, তোমার গল্প বুঝেছি ঠাকুমা! ঠাকুরদার নাম ছিল দিবাকর। দিবাকর মানে সূর্য, আর সূর্যের আলোয় সাতটা রঙ আছে, ভিবজিওর। এইটেই গল্প করে বললে তুমি, না? স্বামীর নাম করতে নেই বলে সূর্যের নাম করনি, নয়?'

ঠাকুমা হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কী বই পড়িস তোরা আজকাল? আমরা গ্যানো পড়েছিলাম।'

ফন্‌তি হঠাৎ ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে চুম্‌ খেলে।

'সর আর জ্বালাসনে তুই। ধুমসি কোথাকার—'

বিমল বলে উঠল, 'বোলো ভাই ঠাকুমা মহারানী কী জয়—'

সবাই সমস্বরে বললে—'জয়!'

মায়াকানন

এক

তাম্রপুরীর রাজপুত্রের মনে সুখ নেই। তাঁর কেবলই মনে হয়—কী হবে রাজ্য-ঐশ্বর্য নিয়ে, যদি মায়ের দুঃখই না ঘোচাতে পারলাম! মায়ের চোখে ঘুম নেই, মুখে অন্ন নেই, তিনি দিবারাত্রি কেবল কাঁদেন। রাজপুত্র ছেলেবেলা থেকেই এই দৃশ্য দেখছেন, মায়ের হাসিমুখ মনে পড়ে না তাঁর। বাবার চেহারা মনেই নেই। রাজপুত্র যখন শিশু, তখনই তিনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। তাঁর সৈন্য শান্ত্রী, অনুচর পরিচর, সামন্ত সেনাপতি, হাতি ঘোড়া, রথ রথী, কেউ ফেরেনি। তারপর থেকেই রাজ্যে অন্ধকার নেমেছে। অনেকদিন প্রতীক্ষা করে করে রানীমা শেষে শয্যা নিয়েছেন।

রাজপুত্র যতদিন ছোট ছিলেন, মন্ত্রীমশায় রাজ্য চালাতেন। রাজপুত্র বড় হতেই তিনি রাজ্যভার তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'রাজপুত্র, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তোমার রাজ্য তুমি বুঝে নাও, আমি বানপ্রস্থে যেতে চাই।'

রাজপুত্র বললেন, 'মন্ত্রীমশায়, আমার বাবা কোথায়?'

'তা তো জানিনা। তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি, মনে হয় আর ফিরবেন না। তুমিই সিংহাসনে বসে প্রজা পালন কর।'

'কোন্ দিকে গিয়েছিলেন তিনি, জানেন ?'

'তিনি রজতপুরী জয় করতে গিয়েছিলেন।'

'কোন্ দিকে সে রজতপুরী ?'

'তা জানিনা।'

'বাবা যখন ফিরলেন না, তখন তাঁকে খোঁজবার জন্য লোক পাঠান নি ?'

'পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি। কারণ, মহারাজ চলে যাবার ঠিক পরেই ভীষণ বর্ষা নামে। বহুদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর যখন বর্ষা থামল তখন দেখা গেল, আমাদের রথের চারিপাশে সমুদ্র হয়ে গেছে। যে সমুদ্র এখন তাম্রপুরীকে ঘিরে আছে, আগে তা ছিল না।'

'তাই নাকি !'

'হ্যাঁ। মহারাজের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করে আমরা আমাদের ময়ূরপঙ্খী নৌকোগুলি সব একে একে পাঠালাম তাঁকে খোঁজবার জন্যে, কিন্তু একটিও ফিরল না।'

মন্ত্রীমশায় চুপ করে রইলেন।

রাজপুত্র বললেন, 'কী উপায় হবে তাহলে মন্ত্রীমশায় ? বাবাকে খোঁজবার কোন চেষ্টাই কি তাহলে আমরা করব না ?'

'কী করে যে করবে, তা তো বুঝতে পারছি না। আমি এতকাল ঐ কথাই ভেবেছি কেবল। কিচ্ছুই ঠিক করতে পারিনি। ভেবে ভেবে মাথার চুল পেকে গেল, বুড়ো হয়ে গেলাম, এখন তো কোনও বুদ্ধিই আমার মাথায় আর খেলে না। আমাদের রাজ্যে আর নৌকো নেই, নৌকো তৈরি করবার লোকও নেই। সকলেই মহারাজের দিগ্বিজয়-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কেউ আর ফেরে নি। অথচ নৌকো না হলে ঐ দুস্তর সাগর পার হওয়ার তো কোনও উপায় দেখি না।'

আবার চুপ করলেন মন্ত্রীমশায়।

তারপর বললেন, 'আমাকে এবার বিদায় দাও, রাজকুমার। আমি অসমর্থ হয়েছি, তোমার রাজ্যের ভার তুমি নাও। আমি বানপ্রস্থে গিয়ে বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাতে যদি কোনও ফল হয়।'

মন্ত্রীমশায় চলে গেলেন।

পরদিন তাম্রপুরীর রাজকুমার তামার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাম্রপুরীর ঘর বাড়ি, পথ ঘাট, আসবাব পত্র সবই তামার।

দুই

রাজপুত্র সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সূর্যোদয় হচ্ছিল। উদীয়মান সূর্যের লাল আলোয় সমস্ত তাম্রপুরী জ্বলজ্বল করছিল। মনে হচ্ছিল তাম্রপুরীর অন্তরের আক্ষেপ বুঝি মূর্ত হয়েছে রৌদ্রালোকিত তাম্রবর্ণের রক্তিম আভায়। রাজপুত্রের মনে পড়ল মায়ের চোখদুটি। কেঁদে কেঁদে ঠিক এই রকমই লাল হয়েছে তারা।

রাজপুত্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

সমুদ্র দিগন্তবিস্তৃত।

'বন্ধু'—

রাজপুত্র ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, শ্রীধর দাঁড়িয়ে রয়েছে, রাজ-বাগানের মালী ভূধরের ছেলে শ্রীধর। ভূধরও মহারাজের সঙ্গে দিগ্বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিল। সেও ফেরেনি। শ্রীধর রাজপুত্রের দুঃখ বুঝত, তাই দুজনে বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব।

রাজপুত্র বললেন, 'কী বলছ, বন্ধু?'

'একটা কথা মনে আছে তোমার? তুমি বলেছিলে, তুমি যখন রাজা হবে তখন আবার বাগান তৈরি করবে। এইবার তো রাজা হয়েছ, এস এইবার দুজনে মিলে বাগান তৈরি করি। বাগানের কী

দুর্দশা হয়েছে দেখেছ? সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে, একটি ফুল ফোটে না—'

রাজপুত্র নীরবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজপুত্রের চোখের দিকে চেয়ে শ্রীধর বললে, 'বন্ধু, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি, এখন তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ সমান। কিন্তু আজ আমার মনে হল, এমনভাবে দিনের পর দিন চুপচাপ বসে বসে দুঃখ করে লাভ কী! তার চেয়ে কিছু কাজ করা ভাল। তাতে দুঃখ খানিকটা কমবে বোধহয়। তুমিও বাগান ভালবাস, আমিও বাগান ভালবাসি। এস দুজনে মিলে ভাল বাগান তৈরি করি একটা।'

ম্লান হেসে রাজপুত্র বললেন, 'বেশ, তাই হোক।'

তিন

কিছুদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে রাজপুত্রের বাগান তৈরি হয়ে উঠল। সে বাগানে কতরকম যে ফুল ফুটল, কতরকম যে ফল ধরল তার আর ইয়ত্তা নেই। সাগরপার থেকে নানারকম পাখি উড়ে উড়ে এসে বসতে লাগল গাছের ডালে ডালে। রাজপুত্র খুশি হলেন। মাকে গিয়ে একদিন বললেন, 'মা, শুনেছি বাবা দোলন-চাঁপা ভালবাসতেন, তাই অনেক দোলন-চাঁপা লাগিয়েছি বাগানে। দোলন-চাঁপার বন হয়ে গেছে। আমি নিজে জল দিই তাতে। মনে হয় যেন বাবারই সেবা করছি।'

পরদিন রানীমা নিজে এসে হাজির হলেন বাগানে। হাতে তাঁর তামার ঝারি, ঝারিতে ঝরনার জল। সেই জল তিনি দোলন-চাঁপার গোড়ায় ঢালতে লাগলেন।

একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রত্যহ। দোলন-চাঁপার পাতায় পাতায় জাগল উৎসব, গাঁটে গাঁটে কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল অজস্র।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

কাটল কিছুদিন।

তারপর একদিন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা।

রাজপুত্র একা-একা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, দোলন-চাঁপা বনে প্রকাণ্ড প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে একটা। মস্ত বড়। অত বড় প্রজাপতি রাজপুত্র আর কখনও দেখেন নি। কী চমৎকার তার রঙ! সন্ধ্যার মেঘের মত লাল ডানাদুটি, আর তাতে সোনালি রঙের অসংখ্য ফুটকি। ঠিক যেন লাল মখমলে সোনার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে কেউ।

রাজপুত্র বলে উঠলেন, 'বাঃ, এমন সুন্দর প্রজাপতি তো আর কখনও দেখিনি!'

রাজপুত্রের কথা শেষ হতে-না-হতে প্রজাপতি ঘুরে দাঁড়াল। রাজপুত্র সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রজাপতির মানুষের মত মুখ রয়েছে। ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ, মাথাটি কালো কোঁকড়া চুলে ভরা, চোখদুটি হাসছে।

মেয়েটি হেসে বললে, 'আমি প্রজাপতি নই, আমি রাঙা পরী। তোমাদের দোলন-চাঁপা বনে আমার সই থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

রাজপুত্র বললেন, 'কই দোলন-চাঁপা বনে আর কাউকে তো দেখিনি কোনদিন!'

রাঙা পরী হেসে বললে, 'আমার সই বড় লাজুক, মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়ে।'

তারপর একটি আধফুটন্ত দোলন-চাঁপার দিকে চেয়ে সে বললে, 'ওলো সই, বেরিয়ে আয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে আলাপ কর।'

সঙ্গে-সঙ্গে আধফুটন্ত দোলন-চাঁপাটি আর-একটি পরীতে রূপান্তরিত হল। এরও চোখমুখ ঠিক রাঙা পরীর মত, কেবল ডানাদুটি ধবধবে সাদা। ঠিক যেন দু-টুকরো শরতের মেঘ কেটে কেউ বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠের উপর।

রাজপুত্র অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, 'তুমি এখনই ফুল ছিলে, মানুষ হলে কী করে?'

'আমরা যখন যা খুশি হতে পারি।'

'কী করে?'

'মন্তরের জোরে।'

'আমাকে শিখিয়ে দেবে সে মন্তর?'

'দিতে পারি। সরে এস তাহলে এদিকে. এ মন্তর জোরে বলতে নেই, কানে কানে বলতে হয়

রাজপুত্র সরে গেলেন তার কানের কাছে মুখ এনে রাঙা পরী মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলে তাকে।

'এ মন্তর কখখনো জোরে বোলো না। যখনই দরকার হবে মনে মনে বলবে।'

'আমি পাখি হতে পারব?'

'নিশ্চয়। মন্তরটি বলে মনে মনে ইচ্ছে করলেই যা ইচ্ছে করবে তাই হয়ে যাবে। পরীক্ষা করে দেখ না।'

রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনি পাখি হয়ে গেলেন। মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে লাগলেন চারিদিকে, প্রতি গাছের ডালে গিয়ে বসলেন। সমুদ্রের দিকে উড়ে গেলেন একবার, ইচ্ছে হল উড়ে সমুদ্রটা পার হয়ে যান, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডানাদুটি। ভয় হতে লাগল যদি পড়ে যান সমুদ্রে। ফিরে এলেন। আবার মানুষ হয়ে যখন দোলন-চাঁপার বনে গেলেন তখন দেখেন, পরীরা চলে গেছে। প্রত্যেক দোলন-চাঁপাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি কি শাদা পরী? কথা কও না!'

চার

দিন কাটে।

পরীর কথা রাজপুত্র কাউকে বলেন নি, এমনকি শ্রীধরকেও না।

তাঁর ভয় হত, কাউকে বললে যদি মন্ত্রের শক্তি চলে যায়! আর কাউকে বলা চলবে কি না তা পরীদের জিগ্যেস করা হয়নি। ভাবেন, এবার পরীদের দেখা পেলে কথাটা জেনে নিতে হবে। কিন্তু পরীরা আর আসে না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি প্রত্যেক দোলন-চাঁপার কাছে দিয়ে বলেন, 'তুমি কি শাদা পরী? এস না, গল্প করি একটু।' ফুল কিন্তু ফুলই থাকে, পরী হয় না। যখন কেউ থাকে না, রাজপুত্র পাখি হয়ে পাখিদের সঙ্গে গল্প করেন। কত দূরদুরান্তের পাখি যে আসে! যে সমুদ্র তাম্রপুরীকে ঘিরে রেখেছে সেই সমুদ্রের ওপার থেকে আসে খঞ্জনের দল। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে রাজপুত্রের। তারা আসে, কিছুদিন থাকে, আবার চলে যায়।

হঠাৎ নূতন ধরনের একটা পাখি এল একদিন। গায়ের রং তামাটে, বাঁকানো ঠোঁট, মাথার ঝুঁটি শাদায় কালোয়, চোখের দৃষ্টি প্রখর। অনেকটা চিলের মত হাবভাব, কিন্তু চিল নয়। চিলের চেয়ে বড় দেখতে। উঁচু তালগাছের মগডালে এসে বসল সে, তারপর আকাশের দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠল। রাজপুত্রের মনে হল ঠিক যেন বলছে—'হায় রাজা, হায় রাজা, হায় রাজা—!'

রাজপুত্র অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কী বলছে ও?

রাজপুত্র মনে মনে পরীর মন্ত্র স্মরণ করে ইচ্ছা করলেন যেন তিনি ঠিক ঐরকম পাখি হয়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে হয়েও গেলেন। তখন তিনিও উড়ে গিয়ে বসলেন তার পাশে।

'কে ভাই তুমি?'

'আমি হিমালয়বাসী ঈগল। তোমার বন্ধু খঞ্জনদের সঙ্গে প্রতি বছর আমার দেখা হয়। এ বছরও হয়েছিল। তাদের মুখে তোমার বাবার কথা শুনলাম। তোমার বাবার কী হয়েছে আমি জানি।'

'জান?'

'হ্যাঁ। তোমার বাবাকে, তোমার বাবার সৈন্য-সামন্তকে এক বিরাট অজগর গ্রাস করেছে।'

'বল কী!'

'হ্যাঁ। হিমালয়-চূড়ায় বসে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু তোমার বাবাকেই নয়, অনেক রাজা মহারাজাকে, বণিক সওদাগরকে গ্রাস করেছে ঐ অজগর।'

'তুমি স্বচক্ষে দেখেছ গ্রাস করেছে? কী দেখলে?'

'ঐ অজগর বিরাট হাঁ করে বসে থাকে। এত বিরাট, যে দেখলে মনে হয়না সাপের হাঁ, মনে হয় বুঝি ওটা রজতপুরীর তোরণদ্বার। ভয়ঙ্কর নয়, মনোহর। তার দাঁত থেকে, জিভ থেকে, চোখ থেকে এক রুপোলি আলো বেরুচ্ছে সর্বদা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, আর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়লেই অজগর মুখ বন্ধ করে দেয়, তখন আর বেরুবার উপায় থাকে না।'

'তাহলে আমার বাবা বেঁচে নেই?'

'তা ঠিক বলা যায় না। শুনেছি ও অনেককে গ্রাস করে বটে কিন্তু সবাইকে হজম করতে পারে না। তোমার বাপ হয়ত ওর পেটের ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। অজগরকে মেরে তার পেট চিরে যদি দেখা যায় তাহলে ঠিক বোঝা যাবে—'

'কোথায় থাকে সে? আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও, খড়্গ দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব তাকে।'

ঈগল হেসে বললে, 'খড়্গ দিয়ে তাকে কাটা যায় না। আমরা সাপের শত্রু, সাপকে টুকরো টুকরো করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আমরা ওর কিছু করতে পারি না। বরং ভয় হয়, কাছে গেলে ও-ই আমাদের গিলে ফেলবে। ওর নাম কী জান? লোভ। স্বয়ং গরুড় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ওকে মারতে পারেন, আর কারও সাধ্য নেই। তবে, তিনি বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে,

এসব ছোটখাট কাজে মাথা ঘামাতে রাজি হবেন কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করলে হতে পারে—'

ঈগলের মাথার ঝুঁটিটা ফর্‌র্‌ করে খুলে গেল।

'কী?'

'গরুড় তো আমাদেরই সম্রাট। সমস্ত পাখিরা যদি গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করি তাহলে তিনি "না" বলতে পারবেন না। কিন্তু সমস্ত পাখিরা কি তোমার বাবার জন্যে অত করবে? আমি অবশ্য ঈগল সমাজকে বলব, তারা রাজিও হবে হয়ত। তুমি অন্য পাখিদের বলে দেখ তারা যদি রাজি হয়—'

'বেশ, আমি বলে দেখব।'

'আমি এখন চললুম তাহলে। এই কথাই বলতে এসেছিলুম। কী হল আমাকে খবর দিও খঞ্জনদের মুখে। কেমন?'

'আচ্ছা।'

ঈগল পাখি উড়ে গেল।

রাজপুত্র শুনতে লাগলেন ঈগল পাখি উড়তে উড়তে যেন বলছে—'হায় রাজা, হায় রাজা, হায় রাজা—'

পাঁচ

চামেলিকুঞ্জে বাসা বেঁধেছিল টুনটুনি দম্পতি। তাদের সঙ্গে আগে থাকতেই ভাব ছিল রাজকুমারের। প্রায়ই টুনটুনি সেজে তাদের সঙ্গে গিয়ে গল্প করতেন। টুনটুনিরা জানতই না যে আসলে তিনি রাজপুত্র, মন্ত্রবলে টুনটুনি হয়েছেন।

রাজপুত্র ভাবলেন, সত্যি কথাটা এইবার ওদের খুলে বলা উচিত।

সব শুনে টুনটুনিরা প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল।

'সেকি, তুমি আমাদের রাজপুত্র নাকি?' পুরুষ টুনটুনি বলে উঠল।

'কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য !' বলে উঠল টুনটুনি-গিন্নি।

তারপর তুড়ুক তুড়ুক করে নাচতে লাগল দুজনে।

রাজপুত্র বললেন, 'সব তো শুনলে, এইবার বল তোমরা গরুড়ের কাছে যাবে কি না—'

'নিশ্চয় যাব। আমাদের দলবল সবাইকে নিয়ে যাব !'

রাজপুত্র তখন শালিক সেজে শালিকদের বললেন, টিয়া সেজে গেলেন টিয়াদের কাছে, বুলবুলি সেজে বুলবুলিদের অনুরোধ করলেন। দর্জিপাখি, দোয়েল, বসন্তবউ, বেনেবউ, ফটিকজল, প্রত্যেকের কাছে গেলেন তিনি। ফিঙে, নীলকণ্ঠ, বাদামি-কালো, মাছরাঙা, ছাতারে, কাক, বক, চিল, সারস কেউ বাদ রইল না।

সবাই রাজপুত্রকে কথা দিলে, যেদিন রাজপুত্র তাদের যেতে বলবেন সেইদিনই তারা গরুড়ের কাছে যাবে।

ছয়

তারপর আবার এল খঞ্জনের দল।

'ঈগলের মুখে শুনেছ তো সব ?'

'শুনেছি। এখানকার সব পাখিদের আমি অনুরোধ করেছি গরুড়ের কাছে যাবার জন্যে। তারা রাজিও হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের পাখিদের তো আমি চিনি না—'

খঞ্জনের দল বললে, 'আমরা চিনি। তোমার হয়ে আমরা গিয়ে তাদের অনুরোধ করব।'

'তাহলে তো খুব ভাল হয়।'

'নিশ্চয় করব—'

মহা উৎসাহে খঞ্জনের দল উড়ে চলে গেল। বড় বড় গাছ পাহাড় সমুদ্র নদী পেরিয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল তারা।

আবার কবে তারা ফিরবে ?

রাজপুত্র রোজ প্রতীক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র আর-এক কাণ্ড করলেন।

রানীমা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তামার ঝারিটি নিয়ে বাগানে আসতেন, গাছে গাছে জল দিতেন, কিন্তু তাঁর মুখে হাসি ছিল না। রাজপুত্র মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন জল দিতে দিতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। রাজপুত্র আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, মাকে সব কথা খুলে বললেন একদিন। মা তো বিশ্বাসই করতে চান না প্রথমে। রাজপুত্র তখন বললেন, 'এস না আমি তোমার কানে কানে পরীদের সেই মন্ত্র বলে দিচ্ছি। তুমিও ইচ্ছে করলে পাখি হয়ে যেতে পারবে। তুমি যে-পাখি হতে চাও, মনে মনে তাই ইচ্ছে কর।'

রানীমা সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর হয়ে গেলেন।

তারপর আবার মানুষ হয়ে বললেন, 'পাখিরা যেদিন গরুড়ের কাছে যাবে, আমিও সেদিন ময়ূর সেজে যাব তাদের সঙ্গে। ময়ূরেরা সাপের শত্রু। আমি সে অজগরকে মারতে না পারলেও ক্ষতবিক্ষত করব।'

'আর আমি?'

রাজপুত্র জিগ্যেস করলেন।

'তুমি কুমার, তুমি আমার পিঠের উপর বসে থাকবে।'

রানীমার চোখে ফুটে উঠল একটা অপূর্ব দীপ্তি, যে দীপ্তি নিবে গিয়েছিল এতদিন, যে দীপ্তি রাজপুত্র কখনও দেখে নি।

সাত

কিছুদিন পরে ফিরে এল খঞ্জনরা।

সব শুনে তারা বললে, 'তুমি আর তোমার মা যদি যাও তাহলে তো খুব ভাল হয়। গরুর নিজে যে মাতৃভক্ত! মাকে সংসার পীড়ন

থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। তোমার মা যদি যান, নিশ্চয় রাজি হয়ে যাবেন তিনি। আমরাও এদিকে সব ঠিক করে ফেলেছি। সমস্ত পাখিরা রাজি হয়েছে। আমরা দিনের পাখি, আমরা সকালে যাব, প্যাঁচারা যাবে রাত্রে, তাদের দলপতি হুতোম প্যাঁচা নিয়ে যাবে তাদের। তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে কাল ভোরে ঠিক হয়ে থেকো। উষার রাঙা আলো যেই আকাশের গায়ে লাগবে, অমনি আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের ডাক শুনতে পাবে তোমরা—'

'বেশ।'

খঞ্জনের দল আবার উড়ে চলে গেল মাঠ বন গিরি নদী সমুদ্র মরুভূমি পেরিয়ে।

আট

পরদিন ভোরে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

রাত দুপুরে পূর্বাকাশে যে মেঘগুলি জ্যোৎস্নায় টগরফুলের রাশির মত দেখাচ্ছিল ভোর হতে-না-হতেই সেগুলি হয়ে গেল যেন রক্তজবার রাশি। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল অপূর্ব এক নহবত—লক্ষ পাখির কাকলি।

রানীমা ময়ূর সেজে অপেক্ষা করছিলেন। পাখিদের ডাক শোনা-মাত্র রাজপুত্রকে পিঠে নিয়ে উড়লেন আকাশে।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ময়ূরের পিঠে উড়ে চলেছেন রাজকুমার। আর তাঁর পিছু পিছু চলেছে অসংখ্য রকমের অসংখ্য পাখি। চেনা পাখিদের মধ্যে টিয়া, ময়না, বুলবুলি, হীরেমন, দোয়েল, হরবোলা, বেনেবউ, পাপিয়া, চাতক, কোকিল, ফটিকজল, বউকথাকও, পায়রা, হরিয়াল, ঘুঘু,

কাক, বক, সারস, চিল, শঙ্খচিল, বাজ, টুনটুনি, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, চোরপাখি, চড়াই, ফিঙে, কাঠঠোকরা, টিট্টিভ, মাছরাঙা, কাদাখোঁচা, ভরত, খঞ্জন, ফুলকি, বসন্তবউ, বাশপাতি, সোনাপাখি, মুনিয়া, বাবুই, আবাবিল, শ্যামা, নীল, ময়না, বটের, তিতির, বনমুরগি এরা তো ছিলই, অচেনা পাখি কত যে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। মানস সরোবর আর মেরুপ্রদেশ থেকে এসেছিল হাঁসের দল। হাঁসেদের পিঠে চড়ে চলেছিল পেঙ্গুইনরা। খঞ্জনরা ছিল সবশেষে।

পাখিদের ডাকে মুখরিত হয়ে গেল দশদিক। তাদের ডানায় সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল।

নয়

বিষ্ণুর রথের চূড়ায় গরুড় বসে ছিলেন। কী মনোহর তাঁর রূপ! যেমন গম্ভীর, তেমনি সুন্দর। সমস্ত শুনে বললেন, 'যারা লোভের বশবর্তী হয়ে অপরের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে যায়, তাদের শাস্তি দেবার জন্য ভগবান ঐ লোভ-অজগরকে সৃষ্টি করেছেন। ওটা অজগর নয়, আসলে ওটা কারাগার। লোভী লোকদের ওতে বন্দী করে রাখা হয়। যতক্ষণ না তারা নির্লোভ হচ্ছে ততক্ষণ ও অজগরকে মারা সম্ভব নয়।'

ময়ূরবেশিনী রানী বললেন, 'ক্ষত্রিয় রাজার রাজধর্ম অনুসারে আমার স্বামী দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। তিনি সামান্য লোভী নন। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, এতদিনে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়েছেন তিনি। আপনারা খবর নিন।'

রথের ভিতর বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ছিলেন।

পাখিদের চিৎকারে ও ভিড়ে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। রানীমার কথা শুনে বিষ্ণু বললেন, 'আচ্ছা, আমি এখনই খবর নিচ্ছি। ওহে পবন, তোমার তো সর্বত্র গতি, তুমি খবরটা নাও দিকি—'

পবনদেব 'যথা আজ্ঞা' বলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, পবনদেব চট্ করে ফিরে এলেন।

এসে বললেন, 'রাজা তো নির্লোভ হয়েছেন, ঐ অজগরের পেটে যারা যারা ছিল সবাই নির্লোভ হয়েছেন। কারও আর লোভ নেই।'

বিষ্ণু গরুড়কে আদেশ দিলেন, 'তাহলে আর দেরি করে লাভ কী! গরুড়, চল তাহলে অজগরটাকে শেষ করে ফেলা যাক।'

বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে পিঠে করে নিয়ে সোঁ করে গরুড় উড়ে গেলেন।

পাখির দলও সঙ্গে চলল।

শ্যামলতাহীন এক বিশাল মরুভূমি জুড়ে পড়ে ছিল সেই বিরাট অজগর।

দেখতে দেখতে অজগরকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন গরুড়। সৈন্য-সামন্ত অনুচর-পরিচর সবাইকে নিয়ে রাজা বেরিয়ে গেলেন। ভূধরও এল। বেরিয়েই দেখেন বিষ্ণু আর লক্ষ্মী।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন রাজা।

লক্ষ্মী বললেন, 'রুপোর প্রতি তোমার এত লোভ? আচ্ছা, তার জন্যে আর তোমাকে রজতপুরী জয় করতে হবে না। তোমার তাম্রপুরীকেই আমি রজতপুরী বানিয়ে দেব।'

রাজপুত্র বললেন, 'কিন্তু আমরা বাড়ি ফিরব কী করে? আমাদের রাজত্বের চারিদিকে সমুদ্র হয়ে গেছে, সে সমুদ্র আমরা এত লোকজন নিয়ে পার হব কী করে?'

লক্ষ্মী হেসে বললেন, 'সে গেলেই দেখতে পাবে।'

সবাই যখন সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা রুপোর সেতু এপার থেকে ওপার চলে গেছে। কী সুন্দর কারুকার্য তার!

সেই সেতু পার হয়ে তাঁরা এসে দেখলেন, তাম্রপুরী সত্যিসত্যিই

রজতপুরী হয়ে গেছে। রুপোর তৈরি ঘরবাড়ি ঝকঝক করছে সূর্যালোকে।

শ্রীধর দাঁড়িয়ে ছিল সেতুর এপারে। রাজপুত্রকে সে চুপি-চুপি বললে, 'ভাগ্যিস বাগান করবার বুদ্ধি দিয়েছিলাম, তাই তো এত সব হল!'

'নিশ্চয়। যখন আমরা বাগান তৈরি করছিলাম তখন ভাবতেই পারিনি যে সাধারণ বাগান মায়াকানন হয়ে উঠবে!'

শ্রীধর বললে, 'ভাল করে তলিয়ে দেখলে, সব বাগানই মায়া-কানন। হ্যাঁ, আর একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।'

'কী?'

'ঐ দেখ না।'

রাজপুত্র দেখলেন, রুপোর তৈরি রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের দুপাশে শাঁখ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে রাঙা পরী আর শাদা পরী।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেনে অসম্ভব ভিড়।

তিল ধারনের স্থান হয়ত আছে, মানুষ ধারনের সত্যসত্যই স্থানাভাব! তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি, এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি পোশাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয় তো নহেনই। সুতরাং তাহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বার-কয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিন রাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতিনিটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখের পাতা বন্ধ করিতে পারেন নাই।

কাল তো অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে না ঘুমাইবে!

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন, 'ওরে দাঁড়া!'

শ্রীপতি সামন্ত নেপলিয়ন নহেন তাহা ঠিক, কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-কোট-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

'টেরেনে তো আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, এই একপাশটায় আমি চড়ে পড়ি—'

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, মূর্খ লোক, হয়ত বুঝিতে পারেন নাই—তাই।

বলিলেন, 'ওটা যে ফাসটো কেলাস গো—'

ফাসটো কেলাস চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন, 'আজ্ঞে ওটাতে নয় এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে তো গদি-মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়া মানুষ—গরিব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ—বিশ্বাস করুন হুজুর, তিনরাত্রি ঘুম হয় নাই—'

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানলা দিয়া মুখ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডাণ্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষুদুইটি রক্তাভ—চোখের পাতা নাই। চোখদুটিকে দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোম মুখখানি বিনয়-গদগদ মাথায় টাক। বর্ণ নাতিফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন, 'এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্য ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কী—'

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি সাহেবি পোশাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

'দ্যাট কান্ট বি! আই কানট্ অ্যালাউ!'

সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন, 'আমিও তো হুজুরের চাকরই —চাকর ছাড়া আর কি! অনুমতি যদি করেন দয়া করে—'

এই বৃদ্ধের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর-একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দানে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ—

সামন্ত মতিস্থির করিয়া ফেলিলেন।

'শুনলেন হুজুর—এইটাতেই চড়লাম আমি—কুরুকে পাঠিয়ে দেন

—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি! ওরে, আন্ আন্ এইটেতেই আন্ সব—ওহে—কালীকিঙ্কর—শ্যামাপদ কোথায়—বাঙ্গা,—ও বাঙ্গা, এইখানেই চড়াও সব—'

হৈ হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঙ্গা কয়েক বোঝা শালপাতা, একবাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বঁটি—একটা ছিপ—দুইটি প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট-বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি ও একটিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধুলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঙ্গাকে বলিলেন, 'তুই তাহলে ঐ পাশের কামরাটায় থাক গিয়ে, তোরই মজা হল রে! তামাক, টিকে সব গুছিয়ে রাখ—'

বাঙ্গা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর!—কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার বেচাকেনা করতে হবে—'

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু-র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু-র নির্দেশমত নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবদ্ধ করিলেন।

যদি কেহ গনিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের

গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ইওর টিকেট প্লীজ।'

'মাই টিকেট ইজ ইন মাই স্যুটকেস। প্লীজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।'

'আই কাণ্ট পাঞ্চ ইয়োর ওয়ার্ড! মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেটস্—'

অবশেষে দেখা গেল বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা-সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বেশিক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কী ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি!

ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায়!

'দুর্গা—শ্রীহরি!—'

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল ক্রু যেন সাহেবটিকে বলিতেছে যে, বাঙালী বাবুদের সে ভাল করিয়াই চেনে। সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুলহীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

'ও কুরু মশায়—বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কী! কটা টাকা লাগবে বলুন—আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—'

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। 'বলে কী!'

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়াই দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন, 'আপনি তো হুজুর কলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামত—'

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রু-র দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন, 'কটা বাঙালী আপ্‌ দেখা হ্যায়? জাত তুল্‌কে গালাগালি দেওয়া কোন্‌ দিশি ভদ্রতা রে বাপু? দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—'

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কি না জানি না—কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সহস করিলেন না।

অবাক কাণ্ড

এক

মনি ছেলে খুব ভাল, যেমন পড়াশোনাতে, তেমনি খেলাধুলায়। গ্রামের এক হাই স্কুলে পড়ে সে, বোর্ডিঙে থাকে। স্কুলে পড়াশোনা ভাল হয়, কিন্তু খেলাধুলোর তেমন ব্যবস্থা নেই। গরিব স্কুল। এক ফুটবল ছাড়া অন্য কোনও খেলার সরঞ্জাম রাখতে পারেন নি স্কুলের কর্তৃপক্ষ। মনি যখন গ্রামের পাঠশালাতে পড়ত, তখন থেকেই তার স্বপ্ন, হাইস্কুলে যখন পড়তে যাবে তখন টেনিস খেলা শেখবার সুযোগ পাবে। স্কুলে সে ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে। টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবারও শখ তার। কিন্তু বাবা তাকে এমন স্কুলে পাঠালেন যেখানে টেনিস দূরে থাক ব্যাডমিণ্টন খেলারও ব্যবস্থা নেই। একটা ছেঁড়া ফুটবলের পেছনেই দৌড়চ্ছে স্কুলসুদ্ধ ছেলে।

মনি কিন্তু দমবার ছেলে নয়। তাদের বোর্ডিঙের সামনে খানিকটা মাঠ পড়ে ছিল, মনি বই দেখে মেপেজুপে দেখলে, চমৎকার টেনিস কোর্ট হয় ওখানে। মনি তার বন্ধু বীরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেললে, চাঁদা তুলবে। স্কুলের প্রত্যেক ছেলে যদি কিছু কিছু করে দেয়,—বল, র‍্যাকেট আর নেট হয়ে যাবে। স্কুলের থার্ড মাস্টার মশায়ও উৎসাহ দিলেন এতে। তিনি নিজে নগদ দু-টাকা চাঁদা দিলেন এবং বললেন, মাস্টারদের কাছ থেকে আরও কিছু তুলে দেবেন। খুব উৎসাহিত হল মনি আর বীরেন। কিন্তু চাঁদার খাতা

হাতে করে ছেলেদের কাছে দিনকয়েক ঘুরে বেড়াবার পর তারা নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করলে যে, ছেলেদের কাছে চাঁদা তুলে টেনিস খেলার ব্যবস্থা করা যাবে না। নিচের ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা দিলে না, কারণ টেনিস খেলার বয়সই হয়নি তাদের। টেনিস খেলাব বয়স হয়েছে যাদের, সেরকম ছেলে স্কুলে চল্লিশটির বেশি নেই। তাদের মধ্যে জনপাঁচেক মাত্র চার আনা করে চাঁদা দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকি সব দু আনা করে, তাও কেবল প্রতিশ্রুতি, নগদ কেউ দিলে না। আরও দিনদশেক ঘোরাঘুরির পর মাত্র আড়াইটি টাকা উঠল। থার্ড মাস্টার মশাই আরও পাঁচ টাকা তুলে দিলেন। কিন্তু মাত্র সাড়ে সাত টাকায় টেনিস খেলার ব্যবস্থা হয় না। খুবই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল মনি। বীরেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিচ্ছু ভাবিস নি, হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ঠিক। ভগবান আছেন। আমরা তো কোন খারাপ কাজ করছি না ভাই!'

মনির মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বলে উঠল, 'আরে ছুত্তোর ভগবান-টগবান! ভগবান বলে কিছু নেই; থাকলে. একজন বড়লোক আর একজন গরিব হয় কি রে? আর বড়লোকগুলো দেখবি প্রায় পাজি হয়; ভগবান থাকলে কি পাজি লোকদের অত বাড়-বাড়ন্ত হয়?'

বীরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনি বলে কী! ভগবান নেই? তবে এত মন্দির, মসজিদ, পুজো, মানত সব বাজে! বীরেন একটু ভিরু-গোছের, সে ফ্যালফ্যাল করে মনির মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় থার্ড মাস্টার মশাই এলেন। বীরেন বললে, 'মনি বলছে কী জানেন স্যর? বলছে, ভগবান নেই—'

থার্ড মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'বলেছ তুমি?'

মনির কানের কাছটা লাল হয়ে উঠল।

'ভগবান আছেন তা জানব কী করে? এখনও তো দেখিনি।'

থার্ড মাস্টার হাসলেন একটু। জ্যামিতি পড়াতেন তিনি। বললেন, 'বিন্দু বলে একটা কিছু আছে, তা বিশ্বাস কর তো?'

'করি।'

'কী করে কর? বিন্দু তো দেখা যায় না! বিন্দুর সংজ্ঞাটা হচ্ছে, যার অবস্থান আছে কিন্তু পরিমাপ নেই। ও জিনিস আঁকা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়। রেখাও তাই। যার দৈর্ঘ আছে কিন্তু প্রস্থ নেই, এও কল্পনা করে নিতে হয়, আঁকা যায় না বা দেখানো যায় না। ভগবানও সেই রকম। আছেন, কিন্তু দেখা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়।'

থার্ড মাস্টারমশাই তারপর মনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো ঠিকই, কিন্তু সেটা ঠিক জান না। তোমার চাঁদা কতদূর হল?'

'কিছু হয়নি স্যর। মোটে সাড়ে সাত টাকা হয়েছে।'

'হবে আরও। হেড মাস্টারমশাই কিছু দেবেন বলেছেন।'

থার্ড মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

সেইদিন রাত্রে মনি নিজের বিছানায় মশারির ভিতর শুয়ে যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সেই সময় পাশের ঘরের হরি এসে তাকে টেনে তুলল। 'মনি, ওঠ্ ওঠ্, একজন ভদ্রলোক খুঁজছেন তোকে।'

মনি তাড়াতাড়ি উঠে দেখলে, একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

'ও, তুমিই বুঝি মনি? আমি তোমার বাবার বন্ধু। এখানে একটু কাজে এসেছিলাম, আর রাত্রে তোমার কাছেই থাকব। ভোরে উঠে চলে যাব আবার। শোবার জায়গা হবে একটু?'

'হ্যাঁ হবে, আসুন।'

মনি তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানাটি দেখিয়ে দিলে। 'এখানেই শোন আপনি। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এটা তো তোমার বিছানা, তুমি শোবে কোথায়?'

'আমি কারও কাছে গিয়ে শোব এখন। আপনি শুয়ে পড়ুন

তাঁকে শুইয়ে, মশারিটি ভাল করে মুড়ে দিয়ে মনি বেরিয়ে গেল। খুব আনন্দ হল তার। কিন্তু কারও ঘরেই সে শোবার জায়গা পেল না। অবশেষে কমন-রুমের টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম এল না। ভয়ানক মশা। মশার কামড়ে ছটফট করতে লাগল বেচারা। সমস্ত রাত এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে।

বোর্ডিঙের চাকরটা এসে ঘুম ভাঙাল তার। আর বললে, 'একটি বুড়ো বাবু আপনাকে এই চিঠিটি দিয়ে গেছেন, আর এই বাক্সটা রেখে গেছেন।'

মনি দেখল, কমন-রুমের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্যাকিং কেস রয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল, 'কাল আড়াল থেকে তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছিলাম। থার্ড মাস্টারমশাই ঠিক কথাই বলেছিলেন। ভগবানে তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তুমি সেটা জান না। কাল পরীক্ষা করে দেখলাম। তোমার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়েছি। যার ভগবানে বিশ্বাস নেই, সে ভদ্র হতে পারে না। কারণ, একটু ত্যাগ না করলে, একটু পরার্থপর না হলে ভদ্র হওয়া যায় না। আর, যে পরের জন্য ত্যাগ করতে শিখেছে সে তো পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। সে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করেছে, যে রাস্তায় চললে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়। পরার্থপরতার মূলে আছে ভগবানের আকর্ষণ, সব সময় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। কারও জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু ত্যাগ করলে সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দলাভ হয়, মানে, সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কারণ ভগবানই

তো আনন্দস্বরূপ। তোমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি। এ বাক্সে কিছু উপহার রেখে গেলাম তোমার জন্য।'

চিঠিতে কারও নাম নেই। হাতের লেখা মুক্তোর মত। মনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলল। অবাক হয়ে গেল। বাক্সের ভিতরে রয়েছে ছটা টেনিস বল, চারটে কালো র‍্যাকেট, আর চমৎকার একটি নেট।

ক্যানভাসার

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল সেই সময়টিতেই ক্যানভাসার হীরা-লালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি সৌখিন শাড়ি কেনার শখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলেন, 'যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?'

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

'মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—'

ভৈরব ফিরিয়া দেখে, একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট স্যুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যানভাসার হীরালাল।

ক্যানভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার শহরে যাইবার কথা। যাইতেও ছিল—কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা ওভারক্যারেড হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু বিজনেস হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল, 'আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই?'

'মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে—'

'তা তো আছে। কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—'

'ব্যবহার করে দেখুন—ভাল মাজন—'

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল, 'কচু'—

হাসিয়া হীরালাল বলিল, 'আজ্ঞে না—ভাল মাজন। ব্যবহার করে দেখুন—'

হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া ভৈরব বলিল, 'আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?'

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

'মাজন নেবেন কি এক কৌটো ?'

বিকৃতমুখে ভৈরব বলিল, 'সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত সৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন, বুঝলেন ?'

বলিয়া সে নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর-একবার হাসিল। বলিল, 'বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।'

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল, 'তাতে আপনার কী? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে! ওসব মাজন-ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।'

হীরালাল ক্যানভাসার হইলেও রক্তমাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল, 'আপনিই কি এই গ্রামের মালিক ?'

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যা নাই তাহা সত্য—কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এইসব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছদন জোটানোই দুষ্কর—দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ ফেলিয়া ভৈরব বলিল, 'বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে!'

'গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি ?'

ভীম গর্জনে ভৈরব কহিল, 'বেরিয়ে যান—'

'আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি মশাই—'

ইহার পরেই কিন্তু ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফজোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মারধর করছেন মশাই! গরিব মানুষ—এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—'

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল, 'আচ্ছা, দিন এক কৌটো মাজন—'

আলোক পরী

এক

সুধাংশু আর অনিল দুই বন্ধু। গতবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে দুজনেই কলেজে ঢুকেছে। দুজনেই ভাল ছেলে। পড়াশোনায় ভাল, খেলাধুলোয় ভাল, সব বিষয়ে ভাল। দুজনের মনের মিলও খুব। একটি বিষয়ে কেবল অমিল ছিল। সুধাংশুর ধারণা, পরার্থপরতাটা একটা সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু স্বার্থপরতাটা আরও বড় গুণ, নিজের উন্নতিটা আগে দরকার। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ নিয়ে প্রায়ই তাদের তর্ক হত। দুজনেই নানারকম নজির দেখিয়ে নিজের নিজের মত প্রমাণ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তর্কের কোনও মীমাংসা হত না।

একদিন কিন্তু অদ্ভুত উপায়ে মীমাংসা হয়ে গেল। এক পরী মীমাংসা করে দিলে। সেই গল্পই আজ তোমাদের বলব। তোমরা হয়ত মুচকি মুচকি হাসছ, ভাবছ, পরী বলে কিছু আছে নাকি! আছে বৈকি। পিঠে-ডানা-লাগানো যেরকম পরীর ছবি আমরা রূপকথার বইয়ে সাধারণত দেখি সেরকম পরী আছে কি না জানিনা—আমি অন্তত দেখিনি কখনও—কিন্তু পরী আছে। তারা আমাদের আশে-পাশে অনেক সময় নানা বেশ ধরে ঘুরে বেড়ায়, আমরা চিনতে পারি না। এই যে প্রজাপতির দল নানারঙের পাখা দুলিয়ে উড়ে বেড়ায়, ওরা সবাই প্রজাপতি নাও হতে পারে। কেউ কেউ হয়ত পরী। নির্জন অরণ্যে বা গভীর রাত্রে যেসব সূক্ষ্ম সুর ও শব্দ আমরা শুনতে

পাই, তা হয়ত পরীদের আলাপ। এই যে গাছে গাছে প্রত্যহ অসংখ্য ফুল ফুটছে, কত রঙের কত ধরনের ফুল, ওরা সবাই যে ফুল, তার অকাট্য প্রমাণ আছে কোন ? কোন-কোন ফুল হয়ত পরী, ফুলের ছদ্ম-বেশে আছে ; কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করে, তারপর টুপ্ করে ঝরে পড়ে। স্বপ্নের দেশে চলে যায়। আবার আসে।

সুধাংশু আর অনিল যে-পরীটিকে দেখেছিল তার চেহারা প্রথমে মানুষের মত ছিল না আলোর সূক্ষ্ম রেখা একটি। গঙ্গার ধারে যে গুহাটি আছে, তার ভিতর ঢুকেছিল তারা একদিন। গুহাটির সম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কেউ বলত ওটা নবাবী আমলের সুড়ঙ্গ। বিপদের সময় নবাবরা ঐ গুপ্তপথ দিয়ে পালিয়ে নাকি আত্মরক্ষা করতেন। কেউ বলত ওখানে পুরাকালে এক মুনির আশ্রম ছিল। তাঁর তপস্যায় বিচলিত হয়ে নাগরাজ বাসুকি নাকি পাতাল থেকে উঠে এসেছিলেন। মাটি ফুঁড়ে এসেছিলেন, এসে তপস্বীবরকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারও কারও মতে, ওটা কতকগুলো ফিরিঙ্গির কীর্তি। বহুকাল আগে আমাদের দেশে পর্তুগীজ বণিকরা এসেছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার করা। তারা ডাকাতি, রাহাজানি, মানুষ চুরি, সব রকম করত। অনেকে বলেন, কয়েকটা ফিরিঙ্গি বণিক ঐখানে কিছু গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধান পেয়েছিল, ঐ জায়গাটায় মোগল আমলের এক বড়লোকের বাড়ি ছিল নাকি এককালে। ফিরিঙ্গিরা নাকি ঐ জায়গাটা খুঁড়ে অনেক টাকা, অনেক হীরাজহরৎ পেয়েছিল। তারাও তাদের লুটপাট-করা টাকা নাকি ঐ গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখত।

এই ধরনের নানা গল্প প্রচলিত ছিল গুহাটা সম্বন্ধে। কিছুদিন আগে শোনা যায় দুজন ডানপিটে সাহেব নাকি গুহার মধ্যে ঢুকেছিল, আর ফেরেনি। গুহার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ মাটির নিচে কোথায় যে চলে গেছে তা কেউ জানেনা। শোনা যায় সুড়ঙ্গটা

ভিতরের দিকে গিয়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে, কেউ কেউ বলে, তিন ভাগ। মোট কথা, গুহাটা সম্বন্ধে নানারকম গল্পগুজব প্রচলিত ছিল।

অনিল আর সুধাংশুর অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল গুহাটার ভিতর ঢুকে দেখে ব্যাপারটা কী। সুযোগও হয়ে গেল একদিন। সামনে কিসের যেন ছুটিও পড়ে গেল একটা। শহর থেকে গঙ্গার তীর, যেখানে সেই গুহা আছে, প্রায় দু-ক্রোশের উপর। খুব ভোরে উঠে হেঁটেই রওনা হল দুজনে। চলে যেতে যেতে সেই পুরাতন তর্কটা উঠে পড়ল আবার। হেতুও জুটে গেল একটা। দুজনেই একটা করে পাঁউরুটি নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে যদি দেরি হয়ে যায়, কিংবা তার ভিতরে ঢুকে যদি পথ হারিয়ে ফেলে, তাহলে ও দুটো কাজে লাগবে। কিন্তু রাস্তায় কিছুদূর এগিয়েই দেখা হয়ে গেল এক ভিখারীর সঙ্গে। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, কোটরগত চক্ষু, গায়ে শতছিন্ন একটা আলখাল্লা। পোড়া কাঠের মত হাতদুটো বার করে সে বলতে লাগল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে বাবু, আট-দশ দিন কিছু খেতে পাইনি, দয়া করে কিছু ভিক্ষা দিন আমাকে হুজুর, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন—'

সুধাংশু দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনিল বলল, 'থামলি কেন, চল—'

'ভাবছি আমাদের তো দুটো পাঁউরুটি আছে, একটা ওকে দিয়ে দিলে কেমন হয়—'

'পাগল নাকি! ওকে দিলে আমরা খাব কী?'

'একটাতেই আমাদের দুজনের চলে যাবে না? কতই বা খাব আমরা—'

'খিদের মুখে একটা পাউরুটি তো নস্যি! জোর খিদে পেলে দুটোতেই কুলুবে কি না সন্দেহ।'

ভিখারীটা নাকি সুরে আবার শুরু করল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে বাবু, দোহাই আপনাদের একটা রুটি দিন আমাকে!'

'যাও যাও, খেটে খাও গিয়ে। ভিক্ষে করে পেট ভরে কখনও?'

ধমকে উঠল অনিল।

সুধাংশুর কিন্তু সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল খুব। অনিলের দিকে কাচুমাচু ভাবে চেয়ে সে বললে, 'দিয়েই দি আমার রুটিখানা, কী বল। সত্যিই বেচারার—'

'দিতে হয় দাও, কিন্তু খিদে পেলে আমারটা নিয়ে যেন টানাটানি কোরো না। আমি একটি টুকরো দেব না, তা বলে দিচ্ছি।'

সুধাংশু হাসল একটু। তারপর দিয়ে দিল পাঁউরুটিটা ভিখারীকে।

এই সূত্র ধরে আবার শুরু হল সেই পুরাতন তর্কটা। তর্ক করতে করতেই তারা পৌঁছল গিয়ে গুহার মুখে।

দুই

গুহার ভিতর কিছুদূর গিয়েই তারা বুঝতে পারল, টর্চ না এনে তারা খুব ভুল করেছে। গুহার ভিতর ভীষণ অন্ধকার। মাথাটাও ঘুরতে লাগল তাদের। আস্তে আস্তে হাতড়ে হাতড়ে তবু তারা এগুতে লাগল। মনে হতে লাগল ক্রমশই যেন তারা নিচের দিকে নামছে। কিছু সিঁড়িও পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়ে। সিঁড়ি পেয়ে নামবার কিছু সুবিধে হল যদিও, কিন্তু অন্ধকারেব জন্য অসুবিধেও হতে লাগল খুব। সামনে কিছু আছে কি দেখা যায় না। হোঁচট খেলে কয়েকবার, তবু তারা আরও কিছুদূর গেল। যতদূর সিঁড়ি পাওয়া গেল ততদূর কোনক্রমে নেবে গেল তারা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই দেখা গেল সিঁড়ি আর নেই, একটা ঘরের মত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কিছুক্ষণ হাতড়ে হাতড়েও কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেদিকেই যায় সামনে দেয়াল।

অনিল বললে, 'আজ ফিরে যাই চল। টর্চ নিয়ে আর-একদিন আসা যাবে। আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।' দুজনেই বসে পড়ল। সুধাংশুরও ফিরে যাবার ইচ্ছে করছিল, তারও মাথা ঘুরছিল, কিন্তু এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। ছাদের উপর থেকে একটা সরু আলোর রেখা প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। মনে হল টর্চের অভাবটা কেমন পূর্ণ করে দিলে।

সুধাংশু বললে, 'কোনও ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকল বোধ-হয়।'

অনিল উত্তর দিলে, 'তাছাড়া আর কী, ভালই হল। ঐ যে ওদিকে আর-একটা সুড়ঙ্গের মত দেখা যাচ্ছে। আর-একটু এগিয়ে চল, দেখাই যাক—'

দেখা গেল, ঘরের মেঝেতে এক কোণে সুড়ঙ্গ আছে আর-একটা। সেটা কিন্তু এত ছোট যে তাতে দুজনে একসঙ্গে ঢোকা যাবে না। একে-একে ঢুকতে হবে।

অনিল জিগ্যেস করল, 'ঢুকবি ওর ভিতর?'

'ঢুকব বলেই তো এসেছি।'

'তুই তাহলে আগে ঢোক।'

সুধাংশু ঢুকে পড়ল তার ভিতর। একটু পরে অনিলও ঢুকল।

তিন

দুজনে কিন্তু হাজির হল দু-জায়গায় গিয়ে।

অনিল একটি ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল। ঘরটি একটি মৃদু আলোয় ঈষৎ আলোকিত, কার যেন মৃদু হাসি সমস্ত ঘরখানিতে ছড়িয়ে রয়েছে। অনিলের অবশ্য এ কথা মনে হল না। কারণ আলোকে সে পরী বলে চিনতে পারেনি। তার এবং সুধাংশুর

দুজনেরই মনে হয়েছিল যে, কোনও ফাটল দিয়ে রোদ ঢুকেছে। সুধাংশুকে না দেখতে পেয়ে কিন্তু ভয় হল তার। ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই, অন্য কোথাও যাবার রাস্তাও নেই। ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অনিল যদি আলোর ভাষা বুঝতে পারত, তাহলে অনুভব করত নীরব ভাষায় আলো মৃদু হেসে তাকে যেন বলছে—সুধাংশু না থাকাতে ভালই তো হয়েছে। সমস্ত রুটিটা একাই তো খেতে পারবে, ওকে আব ভাগ দিতে হবে না—

অনিলের কিন্তু এসব কথা মনে হল না। আলোর ভাষা বোঝবার মত বুদ্ধি তার ছিল না। সে সুধাংশুব নাম করে আরও বার-কয়েক ডেকে বসে পড়ল ঘরের মেঝেতে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, খিদেও পেয়েছিল বেশ। পাঁউরুটিটা খেতে গিয়ে কিন্তু অবাক হয়ে গেল সে। একী কাণ্ড! পাঁউরুটি পাথর হয়ে গেছে, ছেঁড়া যাচ্ছে না, ভারীও বেশ। একী! দাঁত বসাবাব চেষ্টা করতেই পাঁউরুটি কথা কয়ে উঠল—

'অনিল, তোমার নীতি অনুসরণ করে আমি স্বার্থপর হয়েছি, আত্মরক্ষার জন্য বর্ম পরেছি। আমাকে সহজে ঘায়েল করতে পারবে না।'

অনিলের সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

চার

সুধাংশু গিয়ে হাজির হয়েছিল আর-একটা ঘরে। খুব ছোট্ট ঘর, আর তার সমস্ত মেঝেটা জুড়ে চিত্র-বিচিত্র-করা প্রকাণ্ড পাথরের মত কি যেন একটা। সুধাংশুও কম ক্লান্ত হয় নি, তারও খুব খিদে

পেয়েছিল। কিন্তু সে তো তার নিজের পাঁউরুটি দান করে ফেলেছে। অনিল তাকে পাঁউরুটির ভাগ দেবে না জেনেও করেছে। সুতরাং ক্ষুধা সহ্য করা ছাড়া উপায় কী। অনিলের ঘরের মত এ ঘরটিও মৃদু আলোয় ভরা। আলো নয়, যেন হাসি! সুধাংশুর পাদুটো ব্যথা করছিল খুব। সেই চিত্র-বিচিত্র পাথরটার উপর সে বসে পড়ল। বসেই কিন্তু লাফিয়ে উঠতে হল তাকে। পাথরটা জীবন্ত, নড়ছে! তারপর ভাল করে চেয়ে দেখলে—ওটা পাথর নয়, বিরাট একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। বিরাট অজগর। অজগর শেষে মানুষের ভাষায় কথাও কইল! সুধাংশু অবাক হয়ে গেল যখন অজগর তার সম্বোধন করল।

অজগর বললে, 'সুধাংশু, তোমারই জন্যে বহুকাল থেকে অপেক্ষা করছি।'

'আমার জন্যে? কেন?'

'তোমাকে খাব বলে।'

'আমাকে খাবে! সেকি!'

'তুমি পরার্থপর ত্যাগী লোক, একটু আগেই নিজের খাবার একজন ক্ষুধার্ত ভিখারীকে দান করেছ। দাতাকর্ণ, দধীচি, শিবি প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে অনিলকে তর্কে হারিয়ে দিয়েছ বারবার। সেজন্য আশা করে আছি আমার ক্ষুধা তুমিই নিবারণ করবে। আমি হাঁ করছি, এস আমার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়। বহুদিন অনাহারে আছি। চলে এস, আর দেরি কোরো না।'

এই বলে অজগর প্রকাণ্ড হাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল সুধাংশুর দিকে। সুধাংশু ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সেও অজ্ঞান হয়ে গেল।

পাঁচ

দুজনের যখন জ্ঞান হল তখন দুজনেই দেখলে তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে, আর একটি ফুটফুটে মেয়ে তাদের দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে। রঙ যেন ফেটে পড়ছে! একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখের তারাদুটি নাচছে আর তা থেকে উপচে পড়ছে আলো। কাপড় ভিজে।

'কী কাণ্ড! এখানে ঢুকেছিলে কেন তোমরা! এই গুহায় ঢুকে কত লোক মারা গেছে জান? ভাগ্যে আমি কাছাকাছি ছিলাম! গোঁ গোঁ শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম। এসে দেখি, তোমরা দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছ। গঙ্গা থেকে আঁচল ভিজিয়ে এনে তোমাদের চোখে মুখে জল দিলাম, তবে তোমাদের জ্ঞান হল। আর কখনও এস না এখানে, এই গুহায় ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বিষাক্ত হাওয়া বের হয়। চল বাইরে চল—'

মেয়েটির সঙ্গে আস্তে আস্তে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখে, গুহায় ঢোকবার দ্বারের কাছে তিনটি বড়-বড় পাকা আম রয়েছে। দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল, দুজনেই আমগুলির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। মেয়েটি মুচকি-মুচকি হাসছে।

অনিল জিগ্যেস করলে, 'এখানে আম এল কী করে?'

মেয়েটি বললে, 'আমার আম। আমি রেখে গেছি এখানে। খেতে ইচ্ছে করছে নাকি?'

'খুব।'

সুধাংশু বললে, 'আমারও খুব খিদে পেয়েছে।'

মেয়েটি হেসে বললে, 'তা বলে সবগুলো দিচ্ছি না। ভাগাভাগি করে নি তাহলে। তোমরা দুজনে একটা একটা করে নাও, আমার জন্যে একটা থাক। বেশি স্বার্থপরতাও ভাল নয়, পরার্থপরতাও ভাল নয়। কী বল? এই নাও—'

মেয়েটি দুজনকে দুটি আম দিলে, তারপর নিজের আমটি নিয়ে ছুটে চলে গেল। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আলোক-পরীকে ওরা চিনতে পারলে না। ওদের তর্কের কিন্তু মীমাংসা হয়ে গেল। ঐ ছোট মেয়েটি ওদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল, কোনও কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সামঞ্জস্য করে না চলতে পারলেই দুঃখ পেতে হয়।

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধবধবে শাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারি মোকদ্দমায় তিনি আসামী—সাতটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে ; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মোকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিশ সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নিচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিশ সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিশ প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা

পুলিশ সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে মাথায় শাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট-বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল হইয়া গিয়াছে।

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুনি-সম্পর্ক-বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, করসা, এবং তাহার মাথায় কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা-গোছের—এবং নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠী। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া দার্শনিক এবং আর একজন গোঁড়া ধার্মিক। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড চাকর নরেশের জন্য ফাউল কাটলেট বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ থিওরি অব্‌ রিলেটিভিটি লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাকে নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন।

মোটেই তা নয়। ইঁহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধহয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। উভয়েই এম্. এ পাশ—নরেশ কেমিস্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজে প্রফেসরি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুই ভাইকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়িতে ইঁহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। অর্থাৎ এত বড়, যে ইহাতে দুই-তিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই পরিবারহীন। নরেশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই পত্নী ইহলোক ত্যাগ করাতে তাঁহার এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন, 'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। রিলেটিভিটির ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন, নির্মলা সত্যই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এইমাত্র।

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়িতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়েই ভালবাসিতেন। পল্টু তপেসের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের স্ত্রী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রাম-আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই—আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো। পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন, 'বাকি অর্ধেকটা

তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক।' তাহাই হইল। পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কী ?

পল্টু নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণি রূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিংবা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গি সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ, আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালবাসিতেন এবং এ বিষয়ে উভয়ের মিলও ছিল অসাধারণ।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ। তিনি স্বভাবতই একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল জ্বর ছাড়িল না, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; নরেশকে বলিলেন, 'আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হত ?'

'বেশ, দেখাও।'

কবিরাজ আসিলেন—সাত দিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল

না, বরং বাড়িল। পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, 'আচ্ছা, একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্ঠীটা দেখালে কেমন হয়? কী বল?'

'বেশ তো! তবে যাই কর, এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলছিলেন—টাইফয়েড।'

'তাই নাকি?'

পল্টুর কুষ্ঠী লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন, 'মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।' কী করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহারও একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ একটা প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন, 'কবিরাজি ওষুধে তো বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই ডাকব নাকি?'

'তাই ডাক নাহয়—'

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পলটু প্রলাপ বকিতেছে— 'মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়?'

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ওষুধ পাওয়া যায়। ঠিক!

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন, 'আমি একবার তারকেশ্বর চললাম, ফিরতে দু-একদিন দেরি হবে।'

'হঠাৎ তারকেশ্বর কেন?'

'বাবার কাছে ধর্না দেব—'

নরেশ আর কিছু বলিলেন না। ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।'

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন-দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি মাটির ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন, 'বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বলিলেন যে রোগীকে যেন ইনজেকশন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তা হলেই সেরে যাবে।'

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন, নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুল-বেলপাতা-পচা জল কিছুতেই খাওয়ানো চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ড হস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইনজেকশন দিতে লাগিলেন এবং ইঁহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

এইরূপ কয়েকদিন চলিল। রোগের উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন, 'ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার। পল্টু কেমন যেন করছে!'

'অ্যাঁ। বল কী!'

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে ফোন করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

'হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আর ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন আপত্তি নেই—আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগগির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—'

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে

করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—'পল্টু খাও—খাও তো বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—'

তাঁহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। চরণামৃত কস বাহিয়া পড়িয়া গেল।

দুই ভিক্ষুক

এক

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি বসে থাকে। পোড়া-পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমনকি, অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার এধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে সসঙ্কোচে বসে থাকে শুধু। ভিক্ষাও চায় না। হাত পেতে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভিড়, পুণ্য সংগ্রহের জন্যই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারীটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানা জনের নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি এমনকি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানারকম। ভিখারী কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জন হলে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটলি করে বেঁধে লাঠি ঠুক-ঠুক করে গঙ্গার ঘাটে যায়····· তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায়নি। কাপড়টি বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসতে হবে কে জানে।

দুই

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর-একটি ভিখারীর আবির্ভাব হল সেই পথে। ন্যুব্জদেহ, স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট পড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারীটি এসে প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজে ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় করে ঢেলে দিল। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না, চলে যাচ্ছিল, সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রঙ টক্‌টকে ফরসা হয়ে গেল···মাথার চুল সোনালি। চেহারাই বদলে গেল একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে উঠল—'আমায় ক্ষমা করে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি—'

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল—'ক্ষমা কর আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে—ভারতবর্ষে ভিখারীর জীবন যাপন কর গিয়ে, যদি কোনদিন তার হাতের ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহলেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ···

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহলে!

'মিস্টার হেস্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধরে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই!'

'ক্ষমা করেছ?'

'নিশ্চয় !'

দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল।

ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজা নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

কবি জানেন

বহুকাল পূর্বে বনমহল নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজা ছিল না, ছিল এক রানী। রানীর নাম ছিল বনদেবী। তিনি এত ভাল ছিলেন যে বনের পশুপাখি গাছপালা সবাই ভালবাসত তাঁকে। তিনিও সবাইকে ভালবাসতেন। আকাশ বাতাস রোদ জ্যোৎস্নার সঙ্গেও ভাব ছিল তাঁর। এরাও তাঁকে খাতির করত, ভালবাসত। এত ভালবাসা পেলে কি আর কোনও অভাব থাকে ? বনমহলের রানী বনদেবী সত্যিই রানীর মত থাকতেন। গাছরা তাঁকে ফল দিত, গাই এসে দুধ দিয়ে যেত, পাখিরা গান শোনাত, ফুলেরা গন্ধ দিত। বনের মধ্যে ছোট্ট একটি নদী ছিল, সে দিত পিপাসার জল। তার জলে আকাশের ছায়া পড়ত। সন্ধ্যা-উষার আলোয় জল রাঙা হয়ে উঠত কখনও, বর্ষার মেঘের ছায়া পড়লে মনে হত নদী যেন নীলাম্বরী শাড়ি পরেছে। কত রকম ছবি যে ফুটে উঠত নদীর বুকে তার আর ঠিক নেই। বনদেবী আর তাঁর সহচরীরা বসে বসে দেখতেন। অনেক সহচরী ছিল তাঁর। তাদের নিয়ে বনমহলে বেশ সুখেই ছিলেন তিনি।

কিন্তু বিপদ এল একদিন। শহর থেকে একদল মানুষ এসে বনমহল ঘেরাও করল। অনেক জিনিস লুটপাট করে নিয়ে গেল তারা। বনদেবী আর তাঁর সহচরীরা খুব উঁচু একটা গাছে উঠে ঘন পাতার আড়ালে বসে দেখলেন সব। বনদেবী বললেন, 'এর ফল ভাল হবে না। নিজেদের অস্ত্রে ওরা নিজেরাই মরবে একদিন।' কিন্তু ওদের সবচেয়ে দুঃখ হল যখন দেখল প্রিয় ঘোড়া পবনকে ওরা বেঁধে

নিয়ে যাচ্ছে। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সকলের। আহা বেচারা!

কিন্তু ঐ পবনই একদিন শহর থেকে লাল রঙের ঘাগরা নিয়ে এল। এক-আধটা ঘাগরা নয়, একগাড়ি ঘাগরা। প্রত্যেকটি লাল টুকটুকে। পবনের চেহারাও অদ্ভুত। মুখে লাগাম, খুরে লোহার নলি, গলায় পুঁথির মালা, তাতে আবার ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। প্রকাণ্ড একটা গাড়ি টানতে টানতে ঝড়ের বেগে পবন এসে ঢুকল বনমহলে। গাড়ির ভিতর অসংখ্য লাল ঘাগরা। পবন যা বলল তাও অদ্ভুত। তাকে দিয়ে ওরা নাকি গাড়ি টানায়। সে গাড়িতে মানুষ থাকে না, মাল থাকে। এক দোকান থেকে মাল নিয়ে আর এক দোকানে যেতে হয়। সেদিন পবন ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এসেছিল। আবার তাকে নাকি ফিরে যেতে হবে।

'ঘাগরাগুলো নামিয়ে নাও তোমরা। কারণ এখুনি আমি চলে যাব। না গেলে ওরা আবার এখানে আসবে, আবার সব লুটপাট করবে। ভয়ঙ্কর লোক ওরা। সিংহপতিকে অবশ্য বলে যাব—।'

বনদেবীর সহচরীরা ঘাগরাগুলো নামিয়ে নিলে গাড়ি থেকে। তারা কখনও ঘাগরা দেখেনি। সবাই বল্কল পরে থাকত। ঘাগরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, 'এ নিয়ে কী করব আমরা?—'

'পর। শহরের মেয়েরা এই জিনিস পরে। পরলে চমৎকার দেখাবে।'

বনদেবী বললেন, 'এ নিয়ে আবার গোলমাল হবে না তো?'

'না। আমি যাবার সময় সিংহপতিকে খবর দিয়ে যাব। তিনি বনমহল পাহারা দেবার ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।

বনমহলের পাশেই বিরাট মহল। সিংহপতি সেখানকার রাজা। সিংহপতির সঙ্গে বনদেবীর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে। বিয়ে দুবছর পরে হবে। বিরাট মহলের নিয়ম, গোঁফ না উঠলে বিয়ে হয় না। সিংহপতির তখনও গোঁফ ওঠেনি। কিন্তু তাই বলে বিক্রমে

তিনি কিছু কম নন। শহরের লোকেরা বনমহল আক্রমণ করেছে শুনলে তিনি ক্ষেপে উঠবেন।

পবন চলে গেল।

বনদেবীর সহচরীরা লাল ঘাগরা পরে বেড়াতে লাগল মনের আনন্দে। তাদের প্রত্যেকেরই গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। লাল ঘাগরায় চমৎকার মানালো তাদের। মনে হতে লাগল যেন নূতন ধরনের ফুলেরা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বনদেবী বললেন, 'এগুলো ছিঁড়ে গেলে আবার শহর থেকে এমনি লাল ঘাগরা আনিয়ে দেব তোমাদের। আর তোমাদের বল্কল পরতে হবে না।'

'সত্যি বলছ?'

সহচরীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘিরে ধরল বনদেবীকে। বনদেবী প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'সত্যি বলছি। আবার আনিয়ে দেব। বরাবর আনিয়ে দেব।'

'কে নিয়ে আসবে শহর থেকে?'

'পবনই হয়ত আবার আসবে। না আসে তো কোন-না-কোন ব্যবস্থা করবই।'

বনদেবীর আশা ছিল, কিছুদিন পরই সিংহপতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যাবে। কারণ একদল প্রজাপতি সেদিন বনমহল থেকে বিরাট মহলে গিয়েছিল। তারা বলল সিংহপতির গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সিংহপতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না। তার প্রচুর লোকবল।

·· বিয়ে কিন্তু হল না। শহরের মানুষদের সঙ্গে সিংহপতির ঘোর যুদ্ধ বেধে গেল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটতে লাগল। যুদ্ধ আর থামে না। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। বনমহলের আকাশের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে লক্ষ লক্ষ তীর বেগে চলে যায়। পাখি দেখা যায় না, অনেক সময় মেঘও দেখা যায় না। এদিকে

পবনের কোনও খবর নেই, সিংহপতিরও কোনও খবর নেই।

···লাল ঘাগরাগুলি ক্রমশ ময়লা হয়ে গেল. ছিঁড়তে লাগল। সহচরীরা ঘাগরার জন্য মুখ ফুটে আর তাগাদা করতে পারে না. কারণ তারা জানে কেন ঘাগরা আসছে না। এই সর্বনেশে যুদ্ধ না থামলে আর আসবেও না। সহচরীরা কিছু না বললেও বনদেবীর খুব কষ্ট হতে লাগল, লজ্জাও হতে লাগল। তিনি ওদের কথা দিয়েছিলেন যে ঘাগরা ছিঁড়ে গেলে নূতন ঘাগরা আনিয়ে দেবেন, বরাবর আনিয়ে দেবেন। কিন্তু এ কী হল! তাঁর কথার নড়চড় কখনও হয়নি, ভগবান কোন-না-কোন উপায়ে বরাবর তাঁর মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার এ কী হল! বনদেবী ভগবানকেই ডাকতে লাগলেন। গভীর রাত্রে উঠে তিনি চুপিচুপি নদীর তীরে চলে যেতেন আর সেখানে চোখ বুজে বসে একমনে প্রার্থনা করতেন—'ভগবান, আমার মান রক্ষা কর। ওদের আমি কথা দিয়েছি। আমার কথা যেন থাকে। রোজই যেতেন। একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বনদেবী রোজ যেমন চোখ বুজে বসে প্রার্থনা করেন সেদিনও তেমনি করছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর বোজা চোখের ভিতর দিয়েও তিনি যেন আলো দেখতে পাচ্ছেন। চোখ খুললেন, দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, 'আপনার একাগ্র প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে ভগবান আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

বনদেবী জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কে?'

'আমি সূর্য। আপনার সহচরীদের ঘাগরার ভার নিয়েছি। আমি যখন ভোরে পূর্বকাশে উঠি তখন আপনার এই নদীর জল টুকটুকে লাল হয়ে যায়। সেই সময় যদি আপনার সহচরীরা নদীর জলে ঘাগরা পরে নেমে স্নান করে তাহলে তাদের ঘাগরা আবার নতুন হয়ে যাবে। একটুও ময়লা থাকবে না, একটুও ছেঁড়া থাকবে না। টুকটুকে লাল হয়ে যাবে আবার।

কথাগুলি বলে সূর্য অন্তর্ধান করলেন।

বনদেবী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখলেন বুঝিবা। কিন্তু স্বপ্নও তো অনেক সময় সত্য হয়।

...সত্যই হল। পরদিন উষার কিরণ পড়ে নদীর জল যখন লালে লাল হয়ে উঠেছে তখন বনদেবীর সহচরীরা তাদের ময়লা ছেঁড়া ঘাগরা পরে নামল তাতে স্নান করবার জন্য। স্নান করে যখন উঠল তখন প্রত্যেকের ঘাগরা শুধু নতুন নয়, অপরূপ হয়ে গেছে। ভগবানের দয়া হলে সবই হয়।

বনদেবী আর-একদিন সূর্যের দেখা পেয়েছিলেন। সেদিনও তিনি নদীতীরে বসে ভাবছিলেন—এই অসম্ভব আশ্চর্য কাণ্ড বারবার কি হবে? পাশেই একটা সূর্যমুখী গাছে প্রকাণ্ড একটা সূর্যমুখী ফুল ফুটেছিল। সে কথা কয়ে উঠল। বলল, 'আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন হবে। বনদেবী চেয়ে দেখলেন, সূর্যমুখীর প্রতিটি পাপড়ি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। বনদেবীর বুঝতে বাকি রইল না যে স্বয়ং সূর্যই ফুলের ভিতর আবির্ভূত হয়ে আশ্বাস দিয়ে গেলেন তাঁকে।

...ঘাগরা সমস্যার সমাধান হল বটে। কিন্তু আর-একটি সমস্যা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। শহরের মানুষদের সঙ্গে সিংহপতির যুদ্ধ ক্রমশ তুমুল হয়ে উঠল। পাখিরা এসে খবর দিলে যে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। সিংহপতির সৈন্য-সামন্তেরা সমস্ত বনমহল ঘিরে রেখেছে, যাতে শহরের মানুষরা সেখানে হানা দিতে না পারে। শহরের মানুষরাও চেষ্টার ত্রুটি করছে না। দেশবিদেশ থেকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র আনাচ্ছে তারা। দুপক্ষের অসংখ্য তীর শন্ শন্ করে আকাশ দিয়ে যাচ্ছে। যে সাঁকো দিয়ে শহরের লোকেরা বনমহলে আসত সেই সাঁকো সিংহপতি নাকি ভেঙে দিয়েছে। তাই পবনও আর আসতে পারে না। ভাঙা সাঁকোর সামনে স্বয়ং সিংহপতি সসৈন্যে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে শহরের মানুষেরা আর সাঁকো তৈরি করতে না পারে।

সমস্ত বনমহল বিপদে আচ্ছন্ন। পাখিরা পর্যন্ত ভয়ে ওড়ে না। যদি কারও গায়ে তীর লেগে যায়! কেবল শকুনি আর কাকেরাই

সব বিপদ তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধ হওয়াতে তাদের যেন সুবিধাই হয়েছে। অনেক মড়া পাচ্ছে তারা। এমন ভোজ বহুদিন তাদের ভাগ্যে জোটে নি। একটি কাকই একদিন নিদারুণ দুঃসংবাদটি বহন করে নিয়ে এল। সিংহপতি যুদ্ধে মারা গেছেন।

…দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত। বনদেবী স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি। আর তাঁকে ঘিরে বসে আছে তাঁর অসংখ্য সহচরীরা। ফুলের মত দেখতে, টুকটুকে লাল ঘাগরা পরা। তাদেরও কারও মুখে কথা নেই।

অনাহারে বসে রইলেন বনদেবী দিনের পর দিন। পাখিরা ঠোঁটে করে ফল এনে কত সাধাসাধনা করল, নদী অনুরোধ করল—আমার জল খাও এসে ; কিন্তু বনদেবীর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তিনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন আর তাঁর সহচরীরাও নির্বাক হয়ে ঘিরে বসে রইল তাঁকে। একদিন বুলবুলির দল এসে দেখলে, বনদেবী মারা গেছেন। তাঁর সহচরীরাও বেঁচে নেই কেউ। বনদেবীর প্রাণহীন দেহ যেন পাথরের মূর্তির মত বসে আছে আর তাঁকে ঘিরে শুয়ে আছে লাল-ঘাগরা-পরা সহচরীর দল।

…তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে। বনদেবীর কথা ভুলে গেছে সবাই, কেবল একজন ছাড়া। তিনি কবি। তিনি জানেন, বনদেবী মরেন নি। নূতন রূপে বেঁচে আছেন। তোমরাও নূতন রূপে দেখেছ তাঁকে, কিন্তু চেন না।

শিউলি গাছ দেখ নি? শিউলি গাছই বনদেবী। শরৎকালে লাল-ঘাগরা-পরা তাঁর সহচরীদেরও তোমরা দেখেছ নিশ্চয়। শিউলি-ফুল হয়ে প্রতি বছর আসে তারা। বনদেবীকে ঘিরে প্রতি বছরই ঝরে পড়ে, আবার ফুল হয়ে ফোটে, আবার ঝরে পড়ে।

কবিই জানেন, মৃত্যু মানে রূপান্তর। তাই তিনি বনদেবীকে ভোলেন নি।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

এই সিরিজে এ পর্যন্ত বেরিয়েছে বনফুল, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিমল দত্ত, জরাসন্ধ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রলাল রায়, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, সুকুমার দে সরকার, লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত কিশোর গল্প থেকে বাছাই করা এক একটি সঙ্কলন গ্রন্থ।

প্রতিটি দু-টাকা